



মাসিক আল-মাগারী

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে
তাদের কে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্চিত
করবেন আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন।

[সূরা : তাওবাহ ১৪]

জিহাদ কিসেভাবে করতে চলায়।

সহীহ মুসলিম

- শরীয়তের দৃষ্টিতে ফেদায়ী তৎপরতা
- জিহাদে নারীর ভূমিকা
- হক্ক-বাতিলের লড়াই প্রেক্ষিত
- ভোটের স্বরূপ-পবিত্র আমানত না শিরকের স্বীকৃতি
- সাম্রাজ্যবাদীদের কালো থাবা
- নাস্তিক্যবাদ ধর্মাস্তকরণ-এনজিও প্রসঙ্গ
- ভারতের চানক্য নীতি ও আজকের বাংলা

প্রথম বর্ষ- পঞ্চম সংখ্যা
শাওয়াল ১৪২৪ হিজরী
অগ্রহায়ণ ১৪১০ বাংলা
ডিসেম্বর ২০০৩ ইস্যায়ী

তথ্যবহুল, মননশীল, গবেষণামুখী ও দীন কায়েমের মুখপত্র

মাসিক আল-মাগাযী

Regd. No- DA-1981/2003

উপদেষ্টা পরিষদ

শাইখ মুসলিম বিন আবদিল্লাহ

শাইখ যাকারিয়া

ড. ইমতিয়াজ আহমাদ

সম্পাদক

শাইখ ইরফানুল আবিদ

নির্বাহী সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মদ সা'দ ইবনু আবদিল্লাহ

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মদ তাওফীক আল-আজাদ

আপনার যে কোন মতামত, পরামর্শ ও
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ই-মেইলের মাধ্যমে
পাঠাতে পারেন।

E-mail : almaghazi2000@yahoo.com

মূল্য : ১০/= (দশ) টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং মক্কা প্রিন্টিং
প্রেস, মগবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ভেতরে যা আছে

☞ দারসুল কুরআন	২
☞ দারসুল হাদীস	৪
☞ সম্পাদকীয়	৫
☞ ইক্বামাতে দীন শরীয়তের দৃষ্টিতে ফেদায়ী তৎপরতা	৬
☞ মুসলিম নারী জিহাদে নারীর ভূমিকা	১০
☞ শাহাদাত কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে প্রকৃত শহীদ কারা	১১
☞ গল্প পাহাড়ে যুদ্ধ	১৪
☞ প্রবন্ধ সুনুত ও বিজ্ঞানের অদৃশ্য মিলবন্ধন	১৬
☞ ফিরে দেখা হকু-বাতিলের লড়াই প্রেক্ষিতঃ ভোটের স্বরূপ-পবিত্র আমানত না শিরকের স্বীকৃতি	১৯
☞ চলতি ঘটনা ইরাকী মুজাহিদের জবানবন্দী	২১
☞ পাথের মুমিনের গুণাবলী ও নিদর্শন	২২
☞ সংবাদ পরিক্রমা	২৫
☞ সাম্রাজ্যবাদীদের কালো থাবা নাস্তিক্যবাদ ধর্মাস্তকরণ-এনজিও প্রসঙ্গ	৩০
☞ হায়াতুল মুজাহিদিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)	৩৪
☞ কবিতা	৩৬
☞ প্রতিবেদন ভারতের চানক্য নীতি ও আজকের বাংলাদেশ	৩৭
☞ বিশ্বব্যাপী মুজাহিদ তৎপরতা	৩৮



قدخلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين - هذا بيان
للناس وهدى وموعظة للمتقين - ولا تهنوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين - ان
يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله^ط وتلك الايام
نداو لها بين الناس^ع وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ
منكم شهداء^ط والله لايحب الظلمين - ولیمحص الله
الذين امنوا ويمحق الكافرين - ام حسبكم ان تدخلوا
الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم
الصبرين - ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان
يلقوه فقد ائتموه وانتم تنظرون - (عمران- ۱۳۷-۱۴۳)

অর্থ (১৩৭): “এরশাদ হচ্ছে- নিশ্চয়ই তোমাদের
পূর্বে অনেক সুনাত-আদর্শ অতীত হয়েছে। এবার
তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখে নাও-
মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কি রূপ হয়েছে।”

(১৩৮) এটি মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ
ভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শক ও উপদেশ।

(১৩৯) আর তোমরা মনক্ষুন্ন হয়োনা, এবং চিন্তিতও
হয়োনা, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তবে তো
তোমরাই বিজয়ী হবে।

(১৪০) এখন যদি তোমাদের গায়ে আঘাত লেগে
থাকে তবে তো ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতিপক্ষের
গায়েও অনুরূপ আঘাত লেগেছে। এতো কালের পালা
বদল মাত্র- মানুষের মধ্যে আমি আবর্তিত করে থাকি।
এর মাধ্যমে আল্লাহ জেনে নিতে চান, তোমাদের মধ্যে
কারা ঈমানদার এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছু
সংখ্যক লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে চান আর
আল্লাহ তো অত্যাচারীদেরকে ভাল বাসেন না।

(১৪১) আর আল্লাহ এর মাধ্যমে মুমিনদেরকে বাছাই
করে নিতে চান এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে
দিতে চান।

(১৪২) তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে
চলে যাবে, অথচ এখনও আল্লাহ জেনে নেননি
তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে, আর কারা
ধৈর্য্যশীল।

(১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যুর আকাংখা করছিলে,
যখন মৃত্যু তোমাদের সামনে আসেনি। এখনতো মৃত্যু
তোমাদের সামনে এসে গেছে এবং তোমরা তা
দেখছ।

উপরে আমরা আল-কুরআনের সূরা আলে-ইমরান
থেকে সাতটি আয়াত উদ্ধৃত করে তার বঙ্গানুবাদ পেশ
করেছি। এখন অতি সংক্ষেপে তার সারমর্ম তুলে ধরার
প্রয়াস পাব।

সূরা আলে-ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত
ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াত কটিতেও
বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহুদ যুদ্ধে বিজয়ের দারপ্রাপ্তে
এসে কতিপয় ভুল-ভ্রান্তি, রাসূলের ﷺ আনুগত্যে
ব্যর্থতা ও প্রতিপক্ষের চাতুর্যপূর্ণ মিথ্যা রটনায় মুজাহিদ
বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিশ্চিত বিজয় পরাজয়ে
রূপান্তরিত হয়। মুমিনগণ হতবিস্ত্রল হয়ে পড়েন।
ভবিষ্যৎ বিপদ আশংকায় চিন্তিত হয়ে পড়েন। এহেন
পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারগণকে ইতিহাস
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার উপদেশ প্রদান করতঃ জমিনে
পরিভ্রমণ করে মিথ্যাবাদীদের পরিনতি স্বচক্ষে দেখার
নির্দেশ দেন। আল-কুরআন থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করার
উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে :

এ পবিত্র গ্রন্থে তোমাদের শিক্ষার জন্যে তোমাদের
পূর্ববর্তী উম্মতের বর্ণনাও রয়েছে।

পরবর্তী ১৩৯-১৪১ নং পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়
তাকসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে- “তোমরা এ
যুদ্ধের ফলাফলে কিছু মনে করনা এবং চিন্তিত হয়ে
বসেও পড়ো না, এ যুদ্ধে যদি তোমরা আহত হয়ে
থাক এবং তোমাদের লোক শহীদ হয়ে থাকে, তাতে
কি হয়েছে? কেননা এর পূর্বে তো তোমাদের শত্রুরাও
আহত ও নিহত হয়েছিল।

এইরূপ উত্থান পতন তো পৃথিবীতে চলেই আসছে। হ্যাঁ, তবে প্রকৃত কৃতকার্য্য তো ওরাই যারা পরিণামে বিজয়ী হয়। আর আমি তো তোমাদের জন্য এ বিজয় নির্দিষ্ট করেই রেখেছি। তোমাদের কোন কোন বারে পরাজয় এবং বিশেষ করে এ ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ ছিল তোমাদের মধ্যকার ধৈর্য্যশীল ও অধৈর্য্যশীলদেরকে পরীক্ষা করা। আর যারা বহুদিন হতে শাহাদাত লাভের আকাংখী ছিল তাদের আকাংখা পূর্ণ করাও একটি কারণ। তারা যেন স্বীয় জান ও মাল আমার পথে ব্যয় করার সুযোগ লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালার অত্যাচারীদেরকে ভাল বাসেন না।

ওহুদ যুদ্ধের বিপর্যয়ের আরও কারণ এই যে, ঈমানদারদের পাপ থাকলে তা মোচন হয়ে যাবে আর পাপ না থাকলে তাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে। এবং এর দ্বারা কাফেরদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যও রয়েছে। কেননা, তারা বিজয়ী হয়ে গঠিত হয়ে যাবে এবং তাদের অহংকার ও অবাধ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এবং শেষে তারা সমূলে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

পরবর্তী ১৪২নং আয়াতের মর্ম অত্যন্ত স্পষ্ট। জিহাদ এবং ধৈর্যের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া যারা জান্নাতে যাওয়ার আশা করে এটা তাদের কল্পনা বিলাস মাত্র। বাস্তবতার সাথে এদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। অত্র আয়াত সহ বেশ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার সহজ-সরল ও অত্যন্ত খোলাখুলী ভাবে বলে দিয়েছে। জান্নাতে যেতে হলে তোমাকে আল্লাহর কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, দ্বীন কায়েমের পথে জিহাদের ময়দানে তুমি একজন লড়াকু সৈনিক। আরও প্রমাণ দিতে হবে যে, এ পথে যত বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন সব কিছু মাকাবিলা করে তুমি একজন অবিচল ধৈর্য্যশীল সৈনিক। কোন প্রকার বিপদ মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন-নিপীড়ন, জেল-যুলুম তোমাকে জিহাদের পথ থেকে এক চুল পরিমাণ বিচ্যুত করতে পারে না। পরবর্তী ১৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন- অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালার বলেনঃ তোমরা এর পূর্বে তো এরূপ সুযোগেরই আকাংখা

করছিলে যে নিজেদের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহ কে প্রদর্শন করব এবং তার পথে শাহাদাত বরণ করবো কাজেই এস; আমি তোমাদেরকে ঐ সুযোগ প্রদান করলাম, তোমরা এখন তোমাদের দুঃসাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর।

জিহাদে নারীর ভূমিকা

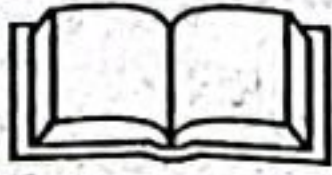
(১০ নং পৃষ্ঠার পর)

একজন বিক্ষুব্ধ মুসলিম নারী এই শত্রুকে হত্যা করে এবং তার মাথা কেটে শত্রু সীমানায় ছুঁড়ে মারে। এজন্য যে, শত্রু পক্ষ যেন সতর্ক হয়। আর যেন সাহস না দেখায় অরক্ষিত মুসলিম নারী ও শিশুদের উপর হামলা করার। দূর্লভ দুঃসময়ে মুসলিম নারীও হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারে। এটা রনাস্থানের মধ্যভাগের যোদ্ধাদের অংশীদারীত্ব এনে দিতে পারে। নারী শুধু স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অস্ত্র তুলে নিবে, এটা ইসলামের অংশ নয়।

মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হজ্জ তখনিই মুসলিম মহিলাদের জন্য জিহাদের প্রতিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যখন তাদের পক্ষে কোন ক্রমেই জিহাদে অংশ গ্রহণ সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আজ অনেক মুসলিম নারীর হৃদয়ে জিহাদের তীব্র বাসনা কাজ করছে। তাঁদের জন্য যেমন এ উপস্থাপনা ঠিক তেমনি তাবৎ মুসলিম নারীকূলের প্রতি বিনীত নিবেদন এমন দুঃসহ মুসলিম নিপীড়নের দিনে জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হোক মন ও মনন। কারণ রাসূল ﷺ এর সেই হাদীস আমাদের সামনে জ্বাজল্যমান, “যদি কোন অন্যায় দেখো, হাত দিয়ে প্রতিহত কর, সম্ভব না হলে মুখে বলো, তাও সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা কর। তবে এটি নিতান্ত দুর্বলতার পরিচায়ক”।

অন্ততঃ এ হাদীসের আলোকে সকল মুসলিম নারী সমাজের উচ্চ স্ব স্ব অবস্থান থেকে জিহাদের পর্যায় এবং ঈমানের দাবী উপলব্ধি করতঃ ইসরাঈল, আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, ভারত সহ সকল মুসলিম বিধ্বংসী শক্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। নিজ দেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় জিহাদরত মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য সহযোগিতা করা। নিজে এবং প্রতিবেশী মহিলাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে মুজাহিদ ভাইদের প্রদান করা। নিজের ছেলে, ভাই, স্বামী ও সকল মুহরিমদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা।



عن ابن الخصاصية رضى الله عنه قال:
أتيت رسول الله ﷺ لأبائعه على الإسلام،
فاشترط على تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا
عبده ورسوله وتصلي الخمس، وتصوم
رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في
سبيل الله قلت: أما اثنتان فلا اطبقهما أما
الزكاة فمالي إلا عشر ذود من رسل أهلي
وحمولتهم وأما الجهاد فيزعمون أن من ولي
فقدباء بغضب من الله فأخاف إن حضرني
قتال، كرهت الموت وخشعت نفسي قال، فقبض
رسول الله ﷺ يده ثم حركها ثم قال: لا صدقة
ولا جهاد فبم تدخل الجنة؟ قال، ثم قلت
يا رسول الله! أبائعك، فبايعني عليهن كلهن -

অর্থঃ ইবনুল খাছাছিয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাসুলুল্লাহর ﷺ নিকট ইসলামের বায়আত গ্রহণ করার জন্য আসলাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার উপর শর্ত দিলেন যে, তুমি একথার স্বাক্ষর দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, এবং নামাজ কায়েম করবে যাকাত আদায় করবে। এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তখন আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এগুলির মধ্যে আমার দু'টি বিষয়ের সামর্থ নেই। একটি হচ্ছে যাকাত, কেননা আমার নিকট দশটি উট আছে তা দিয়ে আমি আমার সংসার চালাই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জিহাদ, কেননা আমি লোকদের থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ময়দানে দুশমনকে পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করে তবে অবশ্যই সে আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরে আসে। এজন্যই আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুকে অপছন্দ করে প্রানের ভয়ে পালিয়ে আসব। সাহাবী বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন এবং বায়আত দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। এবং বললেন : “যাকাতও দিবেনা, জিহাদও করবেনা তবে কিসের বিনিময়ে

জান্নাতে প্রবেশ করবে?” এটা শুনে আমি বললাম ইয়া রাসুল্লাহ ﷺ আমি আপনার নিকট বায়আত ইচ্ছি, আপনি সব বিষয়ের উপর আমার থেকে বায়আত নিন। (মুসতাদরাকে হাকেম, সুনানে বায়হাকী, মুসনাদে আহমদ)

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, রাসূল ﷺ যে ব্যক্তিকে ইসলামের বায়আত নিতেন তার থেকেই কালেমা নামায, রোযার সাথে সাথে জিহাদেরও বায়আত নিতেন। বর্তমানে এ হাদীসের আমল আমাদের সমাজে চোখে পড়েনা। ইসলামের যে রূপ, আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে এ হাদীসের বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

আমাদের সমাজে নামায রোযার যে ভাবে গুরুত্ব দিয়ে আসা হয় সেভাবেই যাকাত, জিহাদের ব্যাপারে উদাসীন থাকা হয়। যাকাত আদায় করলেও সকল মানুষ সঠিকভাবে হিসেব নিকেশ করে যাকাতের সঠিক খাতগুলিতে তা আদায় করে না। যাকাতকে এড়িয়ে চলার বিভিন্ন পদ্ধতি বের করেছে। কারো কোটি কোটি টাকা থাকলেও সে ব্যাংক-লোন দেখিয়ে যাকাত না দেয়ার কৌশল করেছে।

অন্যদিকে জিহাদের ব্যাপারেও জান মালের ক্ষতির আশংকায় বেশীরভাগ মুসলিম আজ তা থেকে গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। অনেকেই তো জিহাদকে এ সমাজে নাযায়েজ ফতোয়া দিয়ে নিজেদের জীবনকে নিরাপদ করার চেষ্টা করে থাকে।

এ হাদীসটি হচ্ছে ঐ সমস্ত নামধারী মুসলমানদের জন্য একটি চরম হুশিয়ারী। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ যাকাত, জিহাদকে আমল না করার কারণে ঐ সাহাবীকে বায়আত দেননি। হাত গুটিয়ে নিয়েছেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারার কারণ বলেছেন। আর আমরা বর্তমান যুগের মুসলমানেরা কিভাবে এ দুটি ছাড়া আল্লাহর নিকট মুক্তির আশা করতে পারি?

সুতরাং এ হাদীস থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে আখেরাতের মুক্তির জন্য আমাদের জীবনকে পূর্ণ মুসলিম হিসেবে সাজাতে হবে। পরিপূর্ণভাবে ইসলামের হক্ক আদায় করার মধ্যেই আছে আল্লাহর দেয়া পুরস্কার।

সম্পাদকীয়



বিশ্ব আজ জোয়ার উঠেছে জিহাদের। দেখতে দেখতে একের পর এক দেশ আজ, তান্ত্রিক আমেরিকা-বিরোধী কর্মকান্ড শুরু করেছে। আফগান, কাশ্মীর, চেকেনিয়া, ইরাক, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও মৌদি আরবেও শুরু হয়েছে মুজাহিদদের অগ্রযাত্রা। আজ আমেরিকা বৃটেন ও তার মিত্রদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে মৃত্যুর দাঙ্গা। বেজে উঠেছে কাফির মুশরিকদের পরাজয়ের ঘণ্টা ধ্বনি। আমেরিকার মুজাহিদ নির্মূলের অমম্ব দাঙ্গিতা আজ চূর্ণ বিচূর্ণ। মুজাহিদদেরকে অম্রাঘী আখ্যা দিয়ে অম্রাঘ নির্মূলের অমম্ব প্রচেষ্টা আজ মুখ খুবড়ে পড়ছে।

একদিকে যখন আমেরিকা মুজাহিদদের অম্রাঘী আখ্যা দিয়ে তার অমম্ব মিডিয়ায় জিহাদ বিরোধী প্রোপাগান্ডায় মস্ত। ঠিক তখনই আল্লাহর দ্বীনের জাগরণের জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন মুজাহিদ, খালিদ ও তারিকরা। আমেরিকা আফগান দখল করে আহমে বন্দীমান হয়েছিল বলেই আবার যে ইরাকে নতুন ফ্রন্ট খোলার আহ্বান পেয়েছিল। কিন্তু যে হড়ে হড়ে টের পাচ্ছে একই সাথে দু'দিকে যুদ্ধ চালানোর অসম্ভব তার জন্য কতটা নিবুদ্ধিতা হয়েছে।

প্রেমিডেন্ট বুশ হোয়াইট হাউসে বসে প্রতিদিনই ইরাকে কোন না কোন মার্কিন সৈন্য হতাহতের খবর পাচ্ছে। শুধু তাই না, সৈন্যরা মানসিক শক্তি হারিয়ে নিজেরাই আত্মহত্যা করে পাপের গ্লানি মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। এখন হয়তো আমেরিকা চাইবে তার যুদ্ধ শুধু ইরাক পর্যন্তই সীমিত থাকুক। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে আশ্রয় শুধু বেড়েই চলেছে দেশের পর দেশে। কোননা আমেরিকার প্রধান শত্রু উসামা বিন লাদেনের ডাকে বিশ্বের আনাচে-কানাচে প্রস্তুত হচ্ছে আমেরিকার উপর

হামলার জন্য প্রতিটি মুসলমান। আর তারই ফলশ্রুতিতে হামলা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, তুরস্ক আরো অনেক দেশে। আমেরিকা তটস্থ হচ্ছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন নতুন হামলা মোকাবিলায়। জিহাদের এই গতি যদি প্রবাহমান থাকে তবে আমেরিকার শুধু টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য হাফাফার করার প্রয়োজন পড়বে না, বরং প্রতিটি মুহুর্তেই এমন বড় বড় আকাশচুম্বী অট্টালিকাতে বিদায় জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর তাই প্রয়োজন আল-কায়েদার সাথে বিশ্ব মুসলিমের একাত্বতা ও কাজের সহযোগিতা।

আমেরিকার কুট বুদ্ধির ফলে এমনি নাযক মুহুর্তে মুসলমানদের ঘরে ঘরে আজো আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মতো জাতির গাদ্দারদের জন্ম হচ্ছে। নানান প্রশ্ন করে ঐমানদারদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে ক্রিষ্টানকে অবরুদ্ধ করার পায়তারা করছে। বুশের সাথে কণ্ঠে মিলিয়ে জিহাদকে বন্ধে টেরোরিজম। গাদ্দারদের এমন কাজের কারণে যুগে যুগে ইসলামের বিজয় থেকে বার বার হেঁচট খেতে হয়েছে। তাই আজ প্রতিটি আল্লাহর সৈনিককে এমন মুনাফিকদের ব্যাপারে সীমায় থাকতে হবে। যাতে করে জিহাদের এই স্রোতধারার সাথে সংযোজিত না হয় আর কোন মহীশুর, পলাশী বা বানাকোটের মত হুম হুম বিদারক দ্রোহেডী।

বিশ্ব মুসলিমের এই অগ্রযাত্রার সাথে মিলিত হতে হবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশকেও। এখন থেকেই গড়ে তুলতে হবে নিবেদিত প্লান একদল আল্লাহর সৈনিকের। যাদের পদচারণায় জেগে উঠবে শরীফুল্লাহ, তীতুমীরের নতুন নতুন কাফেলা, তবেই তো অমম্ব হবে বিশ্ব মুসলিমের উন্নত শির। আল্লাহর কালোমা বুলন্দ হবে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে।

(পূর্ব প্রকাশের পর)

পূর্বের সংখ্যায় বর্ণিত ঘটনাটিই ইসলামের ইতিহাসে ফেদায়ী হামলা সম্পর্কিত একমাত্র ঘটনা নয়। বস্তুত এ ধরনের ঘটনা এত বেশী পরিমাণে ঘটেছে যে, তা মুজাহিদদের বীরত্বের স্মারকে পরিণত হয়েছে।

ইমাম বুখারী, বারা বিন আযিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইয়াহুদী গোত্র প্রধান আবু রাফে'কে হত্যা করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন আতীক কে নিয়োগ করেছিলেন। অপর এক নেতৃস্থানীয় ইয়াহুদী, কাব বিন আশরাফকে হত্যার জন্য নিয়োগকৃত মুহাম্মদ বিন মাসলামা যে বীরত্ব দেখিয়েছেন তা ফেদায়ী তৎপরতাকে আরও একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ একদা আহ্বান করলেন, 'কে আছ কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করতে পারবে?' কা'ব বিন আশরাফ অব্যাহতভাবে মুসলিম মহিলাদের নামে কুৎসা রটনা করে আসছিল এবং সে তার কবিতায় তাঁদের নামে খুবই অশালীন ভাষা ব্যবহার করত। এই ঘটনা সাহাবীদেরকে খুবই বিরক্ত করে তোলে এবং এরকম পরিস্থিতিতে তারা নিজেদেরকে অসহায় ভাবতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে এই অভিযানের জন্য নিয়োগ করেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা একটি ফেদায়ী অভিযান চালিয়ে বহু সংখ্যক গার্ডদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও শত্রু দুর্গের অভ্যন্তর থেকে কা'ব বিন আশরাফকে বের করে এনে হত্যা করেন এবং এখানেই ঐ দুর্বৃত্তের সমস্ত অপতৎপরতার অবসান ঘটে।

ফেদায়ী হামলার অর্থ হল, নিজের জীবনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি করে, যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রের যোগান না থাকা সত্ত্বেও, যেকোন মূল্যে শত্রু নিধনের অভিযানকে পরিপূর্ণ করার সংকল্প নিয়ে আক্রমণ করা। এতে যদি সে নিহত হয় তবে সে শহীদ এবং পাবে

আল্লাহর পক্ষ থেকে অশেষ রহমত আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে হবে গাজী।

ওহদের যুদ্ধও বস্তুত এরকমই এক তৎপরতা ছিল, যাকে ফেদায়ী তৎপরতা বলে অভিহিত করা যায়। কাফেররা রাসূল ﷺ কে অবরোধ করে। চারদিক থেকে অত্যন্ত চাপ প্রয়োগ করে এবং ভাবে যে, এতে রাসূল ﷺ কে খতম করে সমস্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটানো যাবে (আল্লাহ তা হতে দেননি)। তাঁদের অগ্রযাত্রা চলতে থাকে রাসূল ﷺ দরাজ কঠে ঘোষণা করলেন, "কে আছ এমন, যে কাফেরদেরকে হটিয়ে দিয়ে আমাদেরকে এ কঠিন সময় থেকে অব্যাহতি দেবে এবং জান্নাত লাভ করবে?"

তখন ফেদায়ী সাহাবাগণ রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দ্রুত ছুটে আসলেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। কিন্তু তবুও তারা এসেছিলেন রাসূল ﷺ-কে রক্ষার জন্য। যাসর যুদ্ধে আবু আব্দুল্লাহ সাকফী শত্রু পক্ষের হস্তি বাহিনীর অভ্যন্তরে একাকী ঢুকে পড়েন এবং হাতির গুড় কাটতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হয়ে যান। ক্বাদিসিয়ার যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনীর ঘোড়াগুলো শত্রু বাহিনীর হাতি দেখে ভীত হয়ে পড়ল তখন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস বনু যুবায়েদের পক্ষ থেকে সাহায্য চাইলেন। এমতাবস্থায় আমর বিন মা'দ অন্যান্য ফেদায়ীদেরকে সাথে নিয়ে হাতি গুলোর চোখে তলোয়ার চালাতে লাগলেন এবং গুড় কেটে দিলেন। এভাবে আহত হয়ে হাতি গুলো নিজেদের বাহিনীর লোকদেরকে পিষ্ট করে পালাতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা উক্ত যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই ফেদায়ী গ্রুপে মাত্র তিন জন সদস্য ছিলেন যারা ফেদায়ী অধ্যায়কে করেছেন আরো উজ্জ্বল। জিহাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফেদায়ীরা মুসলিম বাহিনীর জন্য অত্যন্ত উপকারী ভূমিকা পালন করেছেন। এ সমস্ত ফেদায়ী স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যানার্থে এমন এক কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন যাতে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এটা লক্ষণীয় যে, এ সমস্ত ফেদায়ীরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করেননি, কিংবা

আগুনেও ঝাপ দেননি। তারা তো কখনও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রু ক্যাম্পে কিংবা দুর্গে অথবা পশুশালায় (অস্ত্রাগারে) ঢুকে পড়েছেন। এই সমস্ত লোমহর্ষক অভিযানকে কোন ইসলামী পণ্ডিত, আলেম অথবা ইতিহাসবিদ “আত্মঘাতী” হামলা বলে গুলিয়ে ফেলেননি। অপরদিকে মুহাদ্দেছীনগণ এই সমস্ত অভিযানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এরকম ঘটনা দিয়ে পৃথক অধ্যায় সাজিয়েছেন।

ইমাম বায়হাকী তার সুনান আল কুবরা (৯৯/৯৯)তে লিখেছেন -

অধ্যায় : নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়কে তুচ্ছ করে শত্রু বুহুর অভ্যন্তরে একজন অথবা কিছু সংখ্যক মানুষের আক্রমণের স্বপক্ষে:- এ অধ্যায়ের অধীনে ইমাম বায়হাকী মুজাহিদ (রহঃ) এর বরাত দিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তা এরকম, আল্লাহর রসূল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এবং আনসারদের ভিতর থেকে তার একজন সঙ্গীকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। এছাড়াও রাসূল ﷺ দাহিয়া বিন ক্বালবি এবং আব্দুল্লাহ বিন আনাসকে অপর দুটি অভিযানে প্রেরণ করেন।

আব্দুল্লাহ বিন আনাস (রাঃ)-কে কাফের দলপতি খালিদ বিন সফওয়ান বিন নবীহকে গুপ্ত হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন যে, আমি খবর পেয়েছি খালিদ বিন সফওয়ান আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছে। তাকে খুঁজে বের করে হত্যা কর। আব্দুল্লাহ বিন আনাস তার অভিযান সফল করার জন্য শত্রু সৈন্যের অভ্যন্তরে ঢুকে যাবার অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন। ইমাম আহমাদ এটিকে সহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম হাকাম তার মুস্তাদরাকে (২৭৫-২৭৬) বারা বিন আযিবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, একদিন বারা বিন আযিবের কাছে একজন লোক এসে বলল যদি আমি একা শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ করি এবং মারা যাই তাহলে কি তা আত্মহত্যা হবে? তিনি বললেন ‘না’। তাঁর ঐ জবাবের সমর্থনে তিনি কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন যেখানে আল্লাহ তার রাসূল ﷺ-কে কিতাল চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং যদি

রাসূলুল্লাহ ﷺ একাও হন তবুও তিনি এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত এবং তাকে কিতাল চালিয়ে যেতে হবে।

হাকামের সংগ্রহে অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে:- একজন লোক বারা বিন আযিবকে বললেন যদি কোন স্বেচ্ছাসেবক এক হাজার শত্রু প্রতিপক্ষের উপর শুধুমাত্র একটি তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করে, তবে কি তা নিজেকে মৃত্যুর মুখে ছুড়ে দেওয়ার নামান্তর হবে? বারা বললেন ‘না’।

ইমাম বায়হাকী এরকমই একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন বারা বিন মালিকের, যে কিনা ইয়মামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মিথ্যাবাদী মুসায়লামা যে ফলের বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলো সেখানে আক্রমণকারী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ বাগানের চারপাশে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন :-

বারা বিন মালিক তার সঙ্গীদেরকে বলেছিলেন, “আমি একটি ঢালের উপর আসন গেড়ে বসছি এবং তোমরা আমাকে তোমাদের বর্শার সাহায্যে এটাকে বাগানের বহির্দেয়ালের উপর পর্যন্ত উঠিয়ে আমাকে ভেতরে ফেলে দিবে।” এভাবে বারা একাকী শত্রু সৈন্যের ভিতরে যেতে সমর্থ হন এবং সেখানে অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে দশজন শত্রুকে খতম করে প্রতিরক্ষা দেয়ালের প্রধান ফটক খুলে দেন। তিনি তার শরীরে আশিটির মত আঘাত পেয়েছিলেন। কোন সাহাবীই এই পরিকল্পনা এবং আক্রমণকে আত্মহত্যা বলে অভিহিত করেননি। ইসলামের অগ্রদূতগণ, উলামা এমনকি সাধারণ মানুষের মনেও এধরনের স্বেচ্ছাসেবী আক্রমণ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই এবং তারা এগুলোকে কখনো আত্মঘাতী হামলা বলে অভিহিত করেননি। এরই ধারাবাহিকতায় উলামা এবং নেতৃবর্গ সবসময় ঈমানদারগণকে এই ধরনের অভিযানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এরকম অবিসংবাদিত বীরত্বগাথার সমর্থনে ফতোয়া জারী করেছেন।

ইমাম আবু হামিদ আল গাজ্জালী তার বিখ্যাত রচনা ‘এহুইয়া-উল-উলূম আদ্বীন’ গ্রন্থে লিখেছেন :-

এখানে কোন বিতর্ক নেই যে, একজন মুসলিমকে শত্রুর একটি পুরো বাহিনীর সাথে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া

যাবে যদিও সে এই পদক্ষেপে নিজের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে ।

আল গাজ্জালী আরো বলেনঃ- এবং কোন মুসলিমকে একাকী শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করার অনুমতি দেওয়া যাবে যদিও সে নিশ্চিত থাকে যে, সে নিজে না মরে শত্রুকে মারতে পারবে না । অন্য কথায় যদি সে আক্রমণ করে তাহলে তাকে মরতে হবে । অথবা যদি সে বিশ্বাস করে যে, তার আক্রমণ শত্রুদেরকে নীতিভ্রষ্ট করবে এবং তাদের দর্প চূর্ণ করে দেবে তবে এ ধরনের অভিযান চালানোর অনুমতি দেয়া যেতে পারে, যাতে শত্রুদের মনোবল ভেঙ্গে যায় । যদি কোন মুসলিমের শত্রু সৈন্যের ভিতরে একাকী ঢুকে যাওয়ার মত অস্বাভাবিক বীরত্ব দেখে শত্রুরা একথা বলতে বাধ্য হয় যে, প্রত্যেক মুসলিম যোদ্ধা শাহাদাতের প্রেমে মশগুল এবং তারা জিহাদ ও আল্লাহর রাস্তায় মরার ভয়ে ভীত নয় তবে তা অনুমোদনযোগ্য ।

ইবনে আন-নাহাস আদ দামেস্কী ফেদায়ী অভিযানের সমর্থনে লিখেছেন যে,

ইমাম নওয়াবী এ বিষয়ের উপর উলামাগণের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, যদি কোন মুজাহিদ পুরোপুরিভাবে শাহাদাতের বাসনা নিয়ে শত্রুপক্ষের অভ্যন্তরে ঢুকে যেয়ে আক্রমণ চালায় তবে তা অনুমোদনযোগ্য এবং কোনমতেই নিষিদ্ধ নয় ।”

ইমাম শাফেয়ী বলেন : রাসূল ﷺ এর উপস্থিতিতে ঘটনা একটি যুদ্ধে উভয় পক্ষ থেকে সৈন্যরা পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল । এবং বদর যুদ্ধে আনসারদের মধ্য থেকে একজন সাহাবী শাহাদাতের প্রেমে মশগুল হয়ে বর্মহীন অবস্থায় শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন । সাহাবাদের জীবন এধরণের অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা দেয়, যেখানে একজন মানুষ বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে শত্রু সৈন্যের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন । ইরানী ও তুর্কীরা এধরণের স্বেচ্ছাসেবী আক্রমণকে ভয় পেত । এধরণের অনেক ঘটনা দেখা যায় যেখানে কোন কোন সাহাবী বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুপক্ষের দর্প চূর্ণ করে দিয়েছেন এবং এধরণের বীরত্বকে কখনই আত্মঘাতী হিসেবে দেখা হয়নি ।

ইবনে আবী শায়বা তার বইয়ের ৫/৩০৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, একজন আনসারী মুসলিমপূর্ব দিক থেকে এসে শত্রুসৈন্যের উপর চড়াও হন । তিনি শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণ করেন এবং সৈন্যদের সারির ভিতর দিয়ে চতুর্মুখী আক্রমণ করতে করতে অপর প্রান্তে পৌঁছে যান ।

তিরমিযি, আবু দাউদ, হাকাম, আসলাম বিন ইয়াযিদ আল নাযিবী থেকে বর্ণনা করেছেন, “যখন আমরা একটি তুর্কী নগরীর বাইরে তারু গাড়লাম, তখন তুর্কীরা এক বিরাট বাহিনী পাঠাল আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য । মুসলিম সৈন্যরা তাদেরকে মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হল । উকবা বিন আমির মিশরী সৈন্যদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং অবশিষ্ট ইসলামী সৈন্যের প্রধান ছিলেন ফযল বিন ওবায়দ । একজন মুসলিম মুজাহিদ শত্রুবাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদের গভীরে চলে গেলেন । মুসলিম সৈন্যদের ভিতর থেকে কিছু সংখ্যক লোক তাকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল এবং বলল যে, এরকম আক্রমণ হল, নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করা । এর প্রতিউত্তরে আবু আইয়ুব আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর সমর্থনে বললেন, “হে লোকেরা, তোমরা আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করেছ । বস্তুতঃ মৃত্যু তো জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ভিতরে ।”

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল কারতাবী তার ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ “উলামাগণ এ বিষয়ের উপর ভিন্নমত পোষণ করেন যখন কেউ একাকী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে অথবা একাকী শত্রুর উপর আক্রমণ করে ।” আল কারতাবী বিভিন্ন উলামাগণের দৃষ্টি থেকে লিখেছেন- কাসিম বিন মুসাইমারাহ, কাসিম বিন মুহাম্মাদ এবং অন্যান্য উলামাগণ বলেন যে, যখন কেউ বিচ্ছিন্নভাবে বিরাট শত্রুসৈন্যের উপর এককভাবে হামলা করে এবং তাতে যদি আল্লাহর রহমত লাভের পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং সে এরকম একটি হামলা করার জন্য যথেষ্ট সামর্থবান হয় তবে তাতে অভিযোগ করার কিছু নেই ।

এবং বলা হয়েছে যে, “যদি তার পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থাকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবার তবে তাকে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য আক্রমণ করতে দাও ।” যদি এমন

ঘটনা ঘটে যে, একজন বিচ্ছিন্নভাবে একশজন লোক অথবা একটি ডাকাত দলের কিংবা একটি বিরাট শত্রু সৈন্য দলের বিরুদ্ধে হামলা করে এবং পরে তার লক্ষ্য পরিবর্তন করে নিরাপদে ফিরে আসে তবে সেটাও উত্তম। আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, সে তার জীবনের বিনিময়ে শত্রুদের বিপুল ক্ষতি সাধন করতে পারবে অথবা মুসলিম জাতির জন্য সুদূর প্রসারী মঙ্গলজনক প্রভাব রেখে যেতে পারবে এবং তা হবে শত্রু সৈন্যের জন্য বিপরীত, তবে এধরনের কর্মও অনুমোদনযোগ্য।

মুহাম্মদ বিন হাসান সিবানি লিখেছেন : এতে কোন ক্ষতি নেই, যদি কোন মুসলিম একাকী এক হাজার শক্তিশালী শত্রুর উপর হামলা করে নিজের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে এবং শত্রুর বিরাট ক্ষতির আশা নিয়ে করে। ”

যদি সে বিশ্বাস করে যে, তার এই বিচ্ছিন্ন আক্রমণ মুসলিম বাহিনীর নৈতিক বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করবে এবং তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহসীকতাপূর্ণ আক্রমণ পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। তবে এ ধরনের কাজে কোন বাধা নেই। কারণ এতে মুসলিম জাতির সমষ্টিগত কল্যান নিহিত রয়েছে। একইভাবে কোন ফেদায়ীর উদ্দেশ্য যদি নিজেদের ধর্মের প্রতি মুসলমানদের অগাধ ভক্তি ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে শত্রুদের মনে ধারণা জন্মানো অথবা তাদেরকে ভয় দেখানো হয়ে থাকে তবে তাও সমানভাবে অনুমোদন যোগ্য। আল্লাহর দলের বিজয়ের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা এবং ইসলামের শত্রুদের ক্ষতি সাধন করা আল্লাহর কাছে সন্দেহাতীতভাবে প্রশংসার যোগ্য এবং আল্লাহ মুসলমানদেরকে এই ধরনের সাহসী পদক্ষেপের জন্য প্রশংসিত ও উৎসাহিত করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ “আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের জান ও মাল, জান্নাতের বিনিময়ে। (আত-তাওবাহ-১১১)

উল্লিখিত আয়াত এবং উলামাদের মতামত আমাদেরকে মুজাহিদ ও ফেদায়ীদের মনোভাব বুঝতে সাহায্য করে। ফেদায়ী তৎপরতা এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং আমরা প্রতিদিনই তাদের অভিযানের

খবর পাচ্ছি। লস্কর-ই-তাইয়েবার ফেদায়ী তৎপরতা এবং সাহবাগণের সময়কার ঘটনার মধ্যে তুলনা মূলক পর্যালোচনা করলে দুয়ের মাঝে গভীর মিল দেখা যায়। যেমনঃ দিল্লীর লাল কেল্লায়, শ্রীনগরে সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে, এয়ারপোর্টে এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টারে লস্কর-ই-তাইয়েবার ফেদায়ী আক্রমণ। সমস্ত সাহসী পরিকল্পনাগুলো দু-চারজন ফেদায়ীর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তারা হিন্দু সেনা অফিসারদেরকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে হত্যা করে অনুকরণীয় ক্ষিপ্ততা ও সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই বীরেরা একজন ভারতীয় অফিসারের অফিসে বসে সেখানকার টেলিফোনের মাধ্যমে BBC এর সাথে যোগাযোগ করেছে এবং তাদের পরিচয় বিশ্ববাসীকে জানিয়েছে। জিহাদের উদ্দেশ্যে এটাই ছিল তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং তাদের সাধ ছিল শাহাদাত ও জান্নাত লাভের। ইবনে শিরীন বর্ণনা করেনঃ বারা বিন মালিক অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি কাত হয়ে শুয়ে কাঁদছিলেন। আনাস বিন মালিক তাঁকে এ অবস্থায় দেখে ভাবলেন যে, তিনি হয়ত মারা যাবেন এবং এজন্য তাঁকে আল্লাহকে স্মরণ করতে নসীহত করলেন। বারা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন “ভাই অনাস আমি শয্যায় শায়িত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবনা। আমি ইতিমধ্যেই ১০০কাফেরকে বিভিন্নযুদ্ধে হত্যাকরেছি। ”

আল্লাহ তার এই খায়েস পূর্ণ করেছিলেন এবং তিনি ইরানী নগরীর অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক কাফেরকে হত্যা করার পর শাহাদাত বরণ করেন।

অপর এক সাহসী যোদ্ধা সোলেমান বিন রাবিয়া আল বারাহ বলেনঃ “আমি আমার তরবারি দ্বারা শিরস্ত্রান ও বর্ম পরিহিত একশত শত্রুকে খতম করেছি। তারা সকলেই ছিল বহু ইশ্বরবাদী এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের উপাসনা করত। আমি তাদের সকলকেই কঠিনভাবে যুদ্ধ করে খতম করেছি, বন্দী অবস্থায় নয়।” চলবে.....।

ইহুদী সন্ত্রাসের পুরোভাগে যার অবস্থান, সেই এয়ারিয়েল শ্যারনের নেতৃত্বে মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র মসজিদ 'আল-কুদস' এ ইয়াহুদীদের অনাহুত অনুপ্রবেশের সময় থেকে জিহাদ আজ তাবৎ পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে এক প্রকাশ্য আলোচিত বিষয়। পবিত্র মসজিদে এই অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ মুসলিম মননে নুতন ভাবনার উদ্রেক করে। এটা ভাবতে বিস্ময় জাগে যে, তার সশস্ত্র সৈনিকদের মহড়া অনুষ্ঠিত হয় ভ্যাটিকান সিটিতে। অথচ, সপলক চোখে উপেক্ষা করে সবাই। এমন বেপরোয়া ইসরাইলী প্রদর্শন। এটা শুধু প্যালেষ্টাইনীদের জন্য অপমান নয়, সকল মুসলিম মিল্লাতেরও।

জিহাদ সেদিনও এমন প্রকাশ্যে আলোচিত হতনা, যখন আফগানিস্তান রাশিয়ার সাথে লড়াইরত ছিল। এই মুহূর্তে জিহাদের বাস্তবতা কাশ্মীর, চেকনীয়া, প্যালেষ্টাইন, কসভো, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন জুড়ে ব্যাপ্ত। সেই জিহাদে মুসলিম নারীর ভূমিকা কি? আসুন প্রথমেই আমরা জিহাদকে বিশ্লেষণ করি। জিহাদ হচ্ছে সর্বাত্মক সংগ্রাম। এটি হতে পারে একই পরিবারের ভিন্নমতের কারুর বিরুদ্ধে। যেহেতু আপনি পর্দা করেন এবং অনৈসলামিক যে কোন কিছুতেই বিব্রত বোধ করেন। সেটি সংশ্লিষ্ট হোক শিক্ষাগত যোগ্যতার কিংবা চাকুরীর ক্যারিয়ারের সাথে। অন্যদিকে শক্তিমত্তার প্রত্যক্ষ প্রকাশও জিহাদে ঘটে। যেমন সশস্ত্র যুদ্ধ। উপরোক্ত ইস্যুতে মুসলিম নারীর অবস্থান কি? আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

“যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল বিশ্বাসীদের। কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে; এবং আল্লাহ নিশ্চিতভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। যারা অন্যায়ভাবে নিজেদের বাড়ি ঘর থেকে বহিস্কৃত হয়েছে এজন্য যে, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের রব।” (সূরা হজ্জ ৩৯-৪০) এবং তোমার প্রতি যে জুলুম করা হয়েছে, কেন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করছ না।

এবং ঐ যে সমস্ত দুর্বল, অসুস্থ ও মজলুম নারী, পুরুষ এবং ছেলে মেয়েরা এমন করে বলছে; হে আমাদের রব আমাদের পরিত্রাণ দাও এ জনপদ থেকে যেখানকার লোকজন জুলুমকারী। এবং তোমার পক্ষ থেকে একজন উত্তোলন কর, যে আমাদের সাহায্য, শক্তিশালী ও সুসংহত করতে পারে। (সূরা নিসা ৭৫)

যখন নারীরা একজন সৈনিক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেনা কিংবা কাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে না, কিন্তু তাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে ভিন্ন পথে জিহাদে শরীক হতে। প্রখ্যাত মহিলা সাহাবা উম্মে আতিয়া আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি মহানবী (সাঃ) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। আমি মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাদের উটের পাহারাদার ছিলাম, রান্না করেছি; অসুস্থ ও আঘাত প্রাপ্তদের শুশ্রূষা করেছি। মা আয়েশা (রাঃ) অন্য মুসলিম নারীদের সঙ্গে রণক্ষেত্রে গিয়েছেন এবং যুদ্ধাহতদের সেবা করেছেন, পানি এনেছেন। আজকের দিনেও ঠিক একই সহযোগিতা প্রয়োজন মুসলিম নারীদের পক্ষ থেকে।

কিছু স্ত্রী, কিছু মাতা আজও মুজাহিদ ক্যাম্পে অবস্থান করছেন সেই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য। মানবতা ও মানুষের মুক্তির জন্য, জিহাদের প্রয়োজনে এমন একজন মাতাকে দেখেছি, যিনি স্বামীর অনুমতিক্রমে স্বীয় সন্তানের সাথে মুজাহিদ ক্যাম্পে অবস্থান করছেন দীর্ঘ দু'বছর। সেখানে তিনি মুজাহিদদের কাপড় পরিষ্কার করতেন।

মুয়ায বিন জাবাল থেকে বর্ণিত, ইয়ারমুক এর যুদ্ধ চলাকালীন তাঁর চাচাত বোন তাঁবুর খুঁটি দ্বারা নয় জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন। এদিকে অন্য সময় মদিনায় একটি অঘটন সংঘটিত হয় অর্থাৎ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন মহিলা ও শিশুদের সুনির্দিষ্ট এক দূরবর্তী জায়গায় রাখা হয় নিরাপত্তার খাতিরে। তাদের কোন পাহারাদার ছিল না। এ দৃশ্য আল্লাহর এক দুশমন দেখতে পায় এবং সে উক্ত স্থানে প্রবেশের চেষ্টা চালায়।

(২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)



কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রকৃত শহীদ কারা?

মাহফুযুর রহমান

‘শাহাদাত’ একটি আরবী শব্দ। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় বা মারা যায়, কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় তাদের ‘শহীদ’ বলা হয়। ‘শহীদ’ একটি আবেগময় পবিত্র শব্দ যার সম্পর্ক আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের ﷺ সাথে, কুরআন আর সুন্নাহর সাথে। ইদানিং স্বার্থান্বেষী লোকেরা যাকে তাকে শহীদ বলে আখ্যা দিচ্ছে। এমনকি কাফের, মুশরিক, অমুসলিম, বেঈমান ও মুনাফেক নিহত হলেও তাদেরকে শহীদ বলে উপাধি দিয়ে তাদের সমাধি গুলোতে কত রকম শিরক-বিদ’আত করে যাচ্ছে। আর ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ-মূর্খ লেখকগণ বই-পুস্তকে পর্যন্ত শহীদের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা লিখে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মগজে এ ভ্রান্ত অর্থ দ্বারা নকল ও কৃত্রিম শহীদের চিত্র বঙ্কমূল করে দিচ্ছে। এসব কারণে অনেক মানুষ ফাঁদে ও খপ্পরে পড়ে তাদের বুলি আওড়াচ্ছে। কারণ সাধারণ মানুষ শহীদের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানেনা।

শহীদ আরবী শব্দ, আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির জন্য এটি নির্ধারিত। শহীদ এর প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা হুবহু উদ্ধৃত করে মানুষের সামনে পেশ করা বিশেষ দরকার যাতে তারা প্রকৃত শহীদ এবং নকল শহীদের যাচাই করতে সক্ষম হয়। **شَهِيدٌ = قَتِيلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ**

(المورد)

অর্থঃ শহীদ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়।
(আল মাওরিদ)

الشَهِيدُ = اللَّهُ كِي رَاه مِين مَقْتُول (مصباح اللغات)

অর্থঃ : শহীদ হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি। (মিসবাহুল লুগাত) উপরোক্ত অভিধানে পরিষ্কার দেখা যায় যে, একমাত্র আল্লাহর পথে নিহত হলেই শহীদ হয়।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কুরআন মাজিদে বলেন, যারা আল্লাহ তায়ালায় পথে নিহত হয় একমাত্র তারাই শহীদ হবে এবং আল্লাহর বিরাট বিরাট পুরস্কার ও বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত পাবে। যেমন :

والذين قتلوا في سبيل الله فلن: يضل أعمالهم سيديهم ويصلح بهم ويدخلهم الجنة
অর্থঃ আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ তাদের আমল সমূহ কখনই নষ্ট করবেননা। তিনি তাদেরকে জান্নাত দেখাবেন আর তাদের অবস্থা সুন্দর করবেন (মহামূল্য পোষাক পরিধান করাবেন,) আর তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন, যে বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে (কুরআনের মাধ্যমে পৃথিবীতে) পরিচয় করিয়েছেন”
(সূরা মুহাম্মদ ৪-৬)

ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه
أجرا عظيما (سورة النساء ৪৭)

অর্থ : আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর সে নিহত হয় বা বিজয়ী হয় আমি তাকে বিরাট পুরস্কার দিব (সূরা নিসা ৭৪)

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة
خير مما يجمعون (سورة آل عمران)

অর্থ : আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও তবে আল্লাহর তরফ থেকে অবশ্যই ক্ষমা ও দয়া রয়েছে যা ঐ সমস্ত বস্তু থেকে অতি উত্তম যা তারা সংগ্রহ করে। (সূরা আল ইমরান ১৫৭)
পাঠকবৃন্দ আপনারা পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ থেকে পরিষ্কার জানতে পারলেন যে, একমাত্র আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হলেই শহীদ হয়। অন্য আর কোন যুদ্ধে নিহত হলে কখনই শহীদ হয়না। তাফসীরে জালালাইনে এর অর্থ **لا علاء دينه** এর অর্থ আল্লাহর দীনকে অতি উচ্চ করার জন্যে যুদ্ধ করে নিহত হলে শহীদ হবে। বিশ্ব নবী ﷺ এর বাণী সমূহ থেকে স্পষ্ট জানতে পারবেন যে, অন্য আর কোন যুদ্ধ তো দূরের কথা ধর্ম যুদ্ধে যেয়েও যদি মনের মধ্যে পার্থিব কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য রাখে তবে তাতেও শহীদ হবে না। যেমন তিনি এরশাদ করেনঃ

عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجر له (رواه أبو داود)

অর্থ : আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বা যুদ্ধ করতে চায়, আবার পার্থিব মাল দৌলতও চায় (যুদ্ধলব্ধ মাল পাওয়ার নিয়তও রাখে) নবী ﷺ উত্তরে বললেন যে, সেই ব্যক্তির জন্য কোন সওয়াব নেই। (আবু দাউদ মিশকাত-৩৩৪) হযরত আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল ﷺ কোন লোক যুদ্ধলব্ধ মালের জন্য যুদ্ধ করে আর কোন লোক মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য যুদ্ধ করে আর কোন লোক বীরত্ব দেখাবার জন্য যুদ্ধ করে। (তারা সকলেই ধর্ম যুদ্ধে লিপ্ত কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য পার্থিব) এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে?” উত্তরে নবী ﷺ বললেন, “তাদের কেহই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেনা কিন্তু যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে ও এ নিয়তে যে, আল্লাহর কালেমা অতি উচ্চ হোক সে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।” (বুখারী ১ম খন্ড ৩৯৪,৪৪০) পাঠক বৃন্দ! উপরোক্ত হাদিসদ্বয় থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, ধর্ম যুদ্ধে মাল অর্জন করবে বা মানুষের নিকট সুনাম ও সুখ্যাতি লাভ করবে অথবা মানুষের নিকট বীর বলে প্রসিদ্ধ হবে অথবা কোন ব্যক্তির উপর ক্রোধ থাকায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিংবা গোত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে নিজের রাষ্ট্র বা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে তবে এ যুদ্ধ গুলোর একটিও আল্লাহর পথে যুদ্ধ হয় না। কারণ এযুদ্ধ গুলো হলো পার্থিব স্বার্থের জন্য যুদ্ধ।

‘শহীদ’ নামকরণের কারণঃ উপমহাদেশের ঐতিহাসিক বিদ্যাপাঠ দারুল উলুম দেওবন্দের সুযোগ্য উস্তাদ মাওলানা জামীল আহমদ, ‘শহীদ’ এর তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১) ফেরেস্তাগণ সম্মান ও মর্যাদার সাথে আল্লাহর দরবারে শহীদদের আত্মোৎসর্গের ব্যাপারে সাক্ষ প্রদান করবেন।

২) শহীদগণ مشهود له بالجنة অর্থ : আল্লাহ কর্তৃক তাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

৩) শহীদগণ চিরঞ্জীব আল্লাহর দরবারে উপস্থিত।

মাওলানা জামীল আহমদ সাহেব ‘শহীদ’ নামের তিনটি কারণ উল্লেখ করলেও সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে শহীদ নামের আরো বহু কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে :-

আল্লামা জাওহারী, কুরতুবী ও ইবনে ফারিস (রহঃ) বলেনঃ শহীদ এই জন্য বলা হয় যে, শহীদের রুহ দেহ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে জান্নাতে উপস্থিত হয়ে যাবে, অথচ অন্যসব মুসলমান কিয়ামতের পর হিসাব দিয়ে জান্নাতে যাবে। আবার কেউ বলেন, শহীদকে ‘শহীদ’ এইজন্য বলা হয় যেহেতু শহীদ কিয়ামতের দিন আপন আঘাত নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় হাশরের মাঠে উপস্থিত হবেন, সে রক্ত ও আঘাত তার জন্য সাক্ষী হবে। কেউ বলেন, শহীদ নিজেই নিজের জন্য সাক্ষী।

প্রকৃত শহীদ কে? আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে প্রকৃত শহীদ। (সহীহ মুসলিম, ৬ষ্ঠ খন্ড) আবীল আওয়ার সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমের ইবনে নুফাইল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি (ইসলাম) ধর্ম হেফাজত করার জন্য নিহত হয় সে ব্যক্তি (প্রকৃত) শহীদ। (আবু দাউদ) ইসলামী ধর্ম যুদ্ধে শহীদ হওয়ার জন্য যে তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল। কারণ এ তিনটি শর্ত যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তারাই শহীদ বলে গণ্য হবে। যদি এ তিনটি শর্ত যুদ্ধাদের মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে ধর্ম যুদ্ধে যেয়ে নিহত হলেও শহীদ বলে গণ্য হবেনা।

যে তিনটি শর্ত শহীদ হওয়ার জন্য অপরিহার্য তা এইঃ

১) আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর উপর খাঁটি ও মজবুত ঈমান রেখে যুদ্ধ করতে হবে এর দলিল প্রমাণ পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত আছে।

والذين آمنوا بالله ورسوله ألك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم (سورة الحديد ১৭)

অর্থ : যারা খাঁটি অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান এনেছে তারাই ছিদ্বীকগণ ও

শহীদগণ তাদের জন্য তাদের রবের নিকট মহাপুরস্কার ও নূর রয়েছে। (সূরা হাদীদ ১৯) “প্রকৃত মুমিনগণ তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর উপর খাঁটি অন্তরে ঈমান এনেছে। এরপর তারা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর উপর) কোন সন্দেহ পোষণ করেনা এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, তারাই সত্যবাদী।” (সূরা হুজুরাত ১৫) উপরে উল্লেখিত আয়াতদ্বয় থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, ধর্ম যুদ্ধে শহীদ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর উপর খাঁটি ও মজবুত ঈমান রাখা। দ্বিতীয় শর্ত হলোঃ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যুদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ বলেনঃ-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةٍ ۚ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (سورة البقرة ২০৭)

আর কতক লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আর আল্লাহ এসব বান্দার প্রতি খুব অনুগ্রহশীল। (সূরা আল বাক্বারাহ ২০৭)

أَنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ (سورة الممتحنة ১)

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন শত্রুদের নিকট গোপনে বন্ধুত্ব বাণী পাঠাও? (সূরা মুমতাহিনাহ-১) তৃতীয় শর্ত হলোঃ আল্লাহর দীনকে কয়েম করা বা অতি উচ্চ করার নিয়ত রেখে জিহাদ করা। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (سورة البقرة ১৯০) “আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর।” (বাক্বারা ১৯০) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة البقرة ২৪৪) “আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। আর জেনে রাখ, আল্লাহ অবশ্যই সব কিছু জানেন এবং সবকিছু শুনে।” (সূরা বাক্বারা-২৪৪) উপরে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিম্নে বর্ণিত দু’টি আয়াতে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে সাথে সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন, তিনি বর্ণনা করেছেনঃ

وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (سورة البقرة ১৭২)

অর্থঃ আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা বাক্বারাহ-১৭৩) এখানে ‘ফিতনা’ এর অর্থ মানুষের বানানো জীবন ব্যবস্থা, কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে বাঁধা। আর দ্বীনের সঙ্গে ফেৎনার সম্পর্ক আল্লাহ এভাবে দেখিয়েছেন যে,

যেখানে দীন নেই সেখানে ফেৎনা থাকবে। দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই ফেৎনাকে উৎখাতের মধ্যে দিয়েই করতে হবে। যদি না করা হয়, তবে ঈমানদারদের সমাজে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্যাতন ও নিপীড়ন হতে থাকবে, এই জন্য আল্লাহ তায়ালা মু’মিনদের কে তাদের জান ও মাল দ্বারা তাঁর পথে ক্বিতাল করতে হুকুম করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة الصافات ১১)

“আর আল্লাহর পথে তোমরা নিজেদের মাল ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।” (সূরা সফ-১১)

উপসংহারঃ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, যাকে-তাকে শহীদ বলা যাবে না। যদি আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি লক্ষ্য করি, তারা তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অথবা মিছিল মিটিং করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণে মারা যাচ্ছে কুরআন ও হাদীস তলিয়ে না দেখে তাদেরকেও আমরা “শহীদ” বলে প্রচার ও প্রপাগান্ডা চালাচ্ছি। সুতরাং আসুন এসব ভণ্ডামী ভুলে গিয়ে একমাত্র ‘লিওয়াজহিল্লাহ’ এর উদ্দেশ্যে তাঁর কালেমাকে উড্ডীন করার জন্য আমাদেরকে সশস্ত্র জিহাদ করে যেতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে আমরা পথে-ঘাটে এমনকি যদি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যু বরণ করি তবুও মহান আল্লাহ আপনাকে আমাকে শহীদের খাতায় নাম লিখাবেন। এখন যদি আমরা বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে যেখানে মুসলিম উম্মাহর বাস, সেখানেই তাদের অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা, এই নরপত্তরা আজ মুসলিম যুবতীদের ধর্ষণ করে তাদের স্তন কেটে ফুটবল খেলে, গর্ভবতী মায়ের পেট কেটে সন্তান বের করে আছড়িয়ে হত্যা করে। যুবকদের মগজ বের করে কুকুরকে খেতে দেয় এবং সাথে সাথে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠে। এহেন পরিস্থিতিতে কোন মর্দে মুজাহিদ অথবা কোন ঈমানদার যুবকের অন্তর স্থির থাকতে পারেনা, পারেনা নীরব দর্শকের গ্যালারীতে বসে থাকতে। তাই এখন সময় এসেছে শহীদি পাগল পারা মর্দে মুজাহিদদের অস্ত্র হাতে নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারেক বিন যিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাশিম ও সালাউদ্দীন আইয়ুবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আপন বক্ষের তাজা রক্ত দিয়ে জাতিকে হেফাযত করতে।

বিকট শীঘ্রের শব্দের পর প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজে তন্দ্রা ছুটে গেল জাহিদ ফজল এর। আসলে এইভাবে একটানা বসে থাকলে তন্দ্রা আসাই স্বাভাবিক। আর এই বসে থাকাতো দুই/এক দিনের নয়। গত শীতের শুরুতে ভারতীয় সৈন্যরা এই এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই তারা প্রচণ্ড শীতে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে কাশ্মীরের প্রায় সমগ্র পাহাড়ী এলাকা দখল করে বসে আছে। তাদের সম্মল বলতে আছে মোটামোটি আধুনিক অস্ত্র যা পরিমাপসত্তাযজনক নয়, অপরিপাণ্ড খাবার ও অতি সামান্য শীত বস্ত্র। তারপরও এই সামান্য সম্মল নিয়ে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে তারা দীর্ঘ ছয়/সাত মাস এখানে অবস্থান করছে। ভারতীয় বিমান আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের মাথার উপর রয়েছে ওভারহেড কাভার। এই দুর্গম এলাকায় যাতায়াত খুবই কষ্টসাধ্য বিধায় তাদের রসদ সরবরাহও খুবই অপ্রতুল।

তন্দ্রা ভাঙতেই চোখ কুচকে খুব ভাল করে চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করল জাহিদ ফজল। বহু দূরে লিপ ফ্রগ মেথডে অগ্রসরমান ভারতীয় সৈন্যদের আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। এসো, আবু জেহেলের ভাই ভাতিজারা, আরো কাছে এসো, মনে মনে বলল জাহিদ। এরকম আসাতো তোমরা অনেক দিন ধরেই আসছ, কিন্তু কই আমাদের নড়াতে পারছ কি? বরং নিজেরাই এরোসলে মরা মশার মত ঝাঁকে ঝাঁকে মরছ। আরেকবার চারদিকে খুব ভাল করে তাকাতেই কাশ্মীর এর অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্যের দিক থেকে কিছুক্ষণের জন্য কোনভাবেই চোখ ফেরাতে পারলনা। সত্যিই আল্লাহ নিজে যেন অকৃপণ হাতে সাজিয়েছেন কাশ্মীরকে। তাইতো একে বলা হয় ভূষর্গ। এই পাহাড়ে সে সহ প্রায় তিনশ মুজাহিদ বাঙ্কার তৈরী করে অবস্থান করছে। ভারতীয় কামান, শেল ও রকেটের গোলা থেকে রক্ষা পেতে মাঝে মাঝে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে হচ্ছে। তারা অবস্থান করছে দ্রাস-সাব

সেপ্টেম্বর প্রায় ১৭০০০ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট টাইগার হিলে। তাদের আশেপাশে বাটালিক, মুশকো, প্রভৃতি সেপ্টরে চলছে ভারতীয় সৈন্যদের সাথে মরণপন যুদ্ধ। কোথাও বা হাতাহাতি লড়াই।

তার আশে পাশে যদিকে চোখ যায় খালি পাহাড় আর পাহাড়। দূরে ঘন সবুজ বনভূমির পাশে বয়ে যাওয়া পাহাড়ী নদী ও মাথার উপর ঘন নীল আকাশ এক শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। বনভূমির হালকা অংশে ফুটে থাকা বিচিত্র রঙ্গের অসম্ভব সুন্দর সব ফুল প্রকৃতির রূপকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তবে এসব উপভোগ করার মত সময় তাদের নেই। মাতৃভূমিকে ভারত এর দখলমুক্ত করার সংগ্রাম সমস্ত কিছুই তাদের কাছে অর্থহীন করে তুলেছে। অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই এলাকা পরিদর্শনে আসা পর্যটকদের মাধ্যমে ভারত যে কোটি কোটি ডলার আয় করতো তা এই যুদ্ধের মাধ্যমে বন্ধ হয়েছে। সত্যিই এটি একটি আনন্দের বিষয়। ভারত এর কোন ক্ষতি, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তাদের করে তোলে উল্লসিত। এরকম যেকোন সংবাদে তারা হয় উজ্জীবিত। তার বাবা তাকে ছোটকালে শিখিয়েছে যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে যতটুকু সম্ভব ভারত এর ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজবে সবসময়। তার বাবা আজ বেঁচে না থাকলেও বানিটি জাহিদ এর হৃদয়ে একটি মূলমন্ত্র হিসাবে বেঁচে রয়েছে।

জাহিদ ফজল এর জন্ম ১৯৭৩ সালে শ্রীনগর থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক গ্রামে। এলাকাটি সম্পূর্ণই পাহাড়ী। ছোটকাল থেকে পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করে খেলাধুলার মাধ্যমে তার শরীর স্বাস্থ্য খুব বেড়ে গিয়েছিল অল্প বয়সেই। এলকার আর দশটা ছেলের মতই সে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছিল। কিন্তু আশেপাশের প্রতিটি দেশের উন্নয়ন যেমন পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ভারত কর্তৃক, ঠিক তেমনি এই ভারত এর কারণেই তার জীবনের স্বাভাবিক যাত্রা ব্যাহত হয়। ছোটকাল থেকেই তারা কমবেশী ভারতীয় অগ্রাসন দেখে অভ্যস্ত। ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক অযৌক্তিকভাবে পুরুষদের অনুপস্থিতিতে কাপুরুষের মত হামলা তারা বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই দেখে

আসছে। এই কারণে কাশ্মীরের প্রতিটি মুসলমান ভারত এর উপর ক্ষিপ্ত। ভারতীয় অগ্রাসন মোকাবেলার একটা ক্রোধ অল্প বয়স থেকেই তাদের ভেতর জন্ম নেয়। মুসলমান এবং পাহাড়ী এলাকার বাসিন্দা হওয়ায় কাশ্মীর এর লোকেরা বেড়ে ওঠে কঠিন শারীরিক সক্ষমতা, মনোবল আর স্বাধীন চেতনা নিয়ে। এক আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে তারা কখনোই মাথা নত করে না। এজন্য সামর্থ্যবান পুরুষদের উপস্থিতিতে নেড়ী কুত্তা ভারতীয় সৈন্যরা কোথাও খুব একটা ঝুট ঝামেলা করতে পারতো না। তার বাবা মাও তাকে ছোটকালে এক আল্লাহ ছাড়া কারও অধীনস্থ না হতে বারবার তাগিদ দিয়েছে। আর ভারত এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাতো ভারতীয়দের আচরণ ও ব্যবহারের কারণে সবার ভিতর এমনিতেই জন্ম নেয়। এরকম পরিস্থিতিতে পাহাড়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে ভালই চলছিল জাহিদ এর জীবন। তবে এই খেলা যে খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবে রূপ নেবে তা সে কখনোই ধারণা করতে পারেনি।

জাহিদ এর বয়স তখন ১৩ বৎসর। একদিন প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে তাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায়। এমনিতে কাশ্মীর-এ আধিপত্যবাদী ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে মাতৃভূমি মুক্ত করার প্রত্যয়ে জীবন বাজি রেখে লড়াইরত মুজাহিদ ভাইদের সংঘর্ষ প্রায় লেগেই থাকে। তাই এইসব লড়াই তাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই দিনের সংঘর্ষ যেন ছিল অন্য রকম। রাইফেল আর এসএমজি'র শব্দ ঐদিন চলেছিল দীর্ঘক্ষণ ধরে। তারপর লড়াই থামলে জাহিদ ফজল দৌড়ে বাড়ি যায়। তবে বাড়ি গিয়ে সে যা দেখে তাতে তার অন্তর শোকে পাথর হয়ে যায়। এলাকাবাসীর কাছ থেকে ঘটনার বিবরণে যা জানা যায় তা হচ্ছে, বহুদিন ধরেই এই এলাকায় ভারতীয় সৈন্যরা প্রায়ই হানা দিত। কাজের সময়ে পুরুষরা না থাকায় তারা মহিলাদের উপর হুম্বিতম্বি করতো। সেই দিন তারা এক মহিলাকে অপহরণের চেষ্টা করতে গেলে প্রচণ্ড শোরগোলের সৃষ্টি হয়। ঘটনাক্রমে খুব নিকটেই মুজাহিদদের একটি দল অবস্থান করছিল। চিৎকার শুনে তারা এগিয়ে এসে আক্রমণ করে তিনজন ভারতীয় সৈন্যকে নরকে পাঠায়। বাকি ভারতীয়

সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে। এর মধ্যে প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত কয়েক প্লাটুন ভারতীয় সৈন্য অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সহ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। মুজাহিদ ও এলাকার গুটিকয় পুরুষ বীরের মত প্রাণপণ যুদ্ধ করে সাত জন ভারতীয় সৈন্যকে যমের বাড়ি পাঠায়। কিন্তু অস্ত্রবল ও জনবল কম থাকায় একসময় তারা সবাই লড়াই করতে করতে শহীদ হয়। এরপর ভারতীয় সৈন্যরা ছোট ঐ জনপদের প্রতিটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটায়, জীবিতদের অনেককে ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা করে এবং লুটপাট করে চলে যায়। রেখে যায় ভারতীয়দের অধিপত্য, দুশ্চরিত্র, কাপুরুষতা ও অত্যাচারের চিহ্ন। আরও ধ্বংস করে রেখে যায় ছোট একটি এলাকার বেশ কয়েকটি পরিবারের ভবিষ্যৎ।

জাহিদ এবং তার সহপাঠী আব্বাস, আমজাদ, মোস্তফাসহ আরও কয়েকজন হতবিস্মল হয়ে ধ্বংসস্তূপের পাশে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কতক্ষণ তা তারা জানতো না। এক সময় আশেপাশের পড়শীরা এসে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নেয়। সেইদিন গভীর রাতে তাদের সাথে যোগাযোগ করে মুজাহিদ দলের একজন সদস্য জাভেদ। সে তাদেরকে নিয়ে যায় দলের কমান্ডার জাফর ভাইয়ের কাছে। জাফর ভাই তাদেরকে জড়িয়ে ধরে অনেক সান্ত্বনা দেন। তার কথায় তাদের শোক বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত প্রকাশিত হয়। অদম্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তারা। এরপর জাফর তাদের খাবার ব্যবস্থা করে। সকাল থেকে পেটে কোন খাবার না পড়ায় তারা সত্যিই খুব ক্ষুধার্ত ছিল। তাই ইচ্ছে না থাকলেও ক্ষিধে তাদেরকে খেতে বাধ্য করল। জাফর তাদেরকে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলে তাদের হাতে তুলে দেয় অস্ত্র। তাদেরকে জানায় সে নিজেও তাদের মতই একজন। অস্ত্র পেয়ে মুহূর্তে তাদের শোক পরিণত হয় শক্তিতে। এরপর বিভিন্ন গহীন এলাকায় প্রায় সাত মাস প্রশিক্ষণ শেষে তাদের পাঠানো হয় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধে কাশ্মীর এর বিভিন্ন এলাকায়।

(৩৩ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)



সুনত ও বিজ্ঞানের অদৃশ্য মিলবন্ধন

সরওয়ার হুসাইন

মূল আলোচনার পূর্বে রাসূল ﷺ-এর সুনাতের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। কারণ এ সম্বন্ধে অনেক বিভ্রান্তি সমাজে বিদ্যমান রয়েছে যাকে কেন্দ্র করে অনেক ফিরকারও আবির্ভাব হয়েছে। বিভ্রান্তির ব্যাপারে মহান রবের কাছে প্রথমেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি। শাদিক অর্থে সুনাত শব্দটির অর্থ রীতি বা পদ্ধতি। যেমনটি কুরআনে রয়েছে— আল্লাহ বলেন, “এটি ছিল আল্লাহর রীতি তাদের ব্যাপারে যারা পূর্বে গত হয়েছে। আর আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। (আহযাব- ৬২)। প্রচলিত সুনত শব্দের অর্থ রীতি ধরলে এর পারিভাষিক অর্থের সাথে কোন সংঘর্ষ হয় না। “কোন মু‘মিন পুরুষ ও মু‘মিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন সে কাজে তাদের কোন নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্যে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।” (আহযাব- ৩৬) আয়াতে কারীমা হতে জানা যায়, আল্লাহ তা‘আলার কোন নির্দেশ অগ্রাহ্য করা যেমন কুফরী তেমন রাসূলেরও। তাই রাসূল ﷺ যেসব আমল সম্বন্ধে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন সেসব পালন করা ওয়াজিব। আর সেসব ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ভালো মনে করা কুফরী। আর রাসূল ﷺ-এর কথা, কাজ এবং মৌন সমর্থনের মধ্যে যেসব উৎসাহ ব্যঞ্জক সেসব সুনাত আমাদের জন্য পালন করা নফল। কঠোর হাদীস এবং আয়াতসমূহ এসেছে সুনতসমূহের মধ্যে যেসব পালন করা ওয়াজিব তার সম্বন্ধে, যেমন— দাড়ি ছেড়ে দেয়া, টাখনুর উপরে কাপড় পড়া ইত্যাদি। সাধারণ সুনত যেমন খাওয়ার পদ্ধতি, পোশাক পরিচ্ছদের ধরণ, মেসওয়াক করা ইত্যাদি বিষয়ে নয়। যেমন, রাসূল ﷺ বলেছেন, “যে আমার সুনত হতে মুখ

ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়”। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ১/৫২ লেবানন)

তেমনি আল্লাহ তা‘আলাও সতর্ক করলেন কুরআনে, “হে রাসূল! তাদেরকে বলে দিন, তারা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় তবে যেন আমার রাসূলকে অনুসরণ করে।” (আলে-ইমরান- ৩১)

এ আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে অনেকে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে যে, রাসূল ﷺ-এর সকল কথা, কাজ এবং মৌন সম্মতির পরিপূর্ণ পালন তথা অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার পূর্ণ ভালবাসা পাওয়া সম্ভব। এটা একদম বানোয়াট ধারণা। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের চেষ্টা থাকলেও তা সম্ভব নয়। তা উদাহরণসহ উল্লেখ করবো— ইনশাআল্লাহ। আমরা অনেকেই জানি যে, রাসূল ﷺ যবের রুটি এবং শুকনো খেজুর অধিকাংশ সময় আহার্য বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন এমনকি মক্কা বিজয়ের দিনেও। তাই বলে পাকিস্তানী মুসলিমগণ (উদাহরণস্বরূপ) গমের আটার রুটি আর বাংলাদেশী মুসলিমগণ ভাত আহার্য বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কি সুনত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে বুখারী মুসলিমের তথা মুত্তাফাকুন আলাইহের হাদীস মতে এরা উম্মাতে মুহাম্মদী নয়। তেমনি রাসূল ﷺ যে লুঙ্গি ব্যবহার করতেন তা ছিল অত্যন্ত মোটা এবং ফাড়া এবং তাঁর ভারী জুব্বার ফাড়া অংশ বাবলা গাছের কাঁটা দিয়ে আটকানো থাকতো। তাই আজকে যারা অপেক্ষাকৃত পাতলা, সেলাই করা লুঙ্গি, বোতাম লাগানো জুব্বা পড়ে নিজেদের সুনতের পাবন্দ বলে প্রচার করেন তারা কি রাসূল ﷺ-এর অনুরূপ পোশাক পড়তে পারলেন? কখনো কি ভেবে দেখেছেন আমি আপনি আজ যে টুপি মাথায় পরিধান করি তার সাথে রাসূল ﷺ-এর টুপির আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল। তাহলে এই ক্ষেত্রেও রাসূল ﷺ-এর হুবহু অনুসরণ করা হলো কই? ভূমিকা খুবই বড় হয়ে যাওয়ায় উদাহরণ এখানেই সংক্ষিপ্ত করছি।

আসলে গোড়ামীই আমাদের ভ্রান্তি পথে অগ্রসর হওয়ার মূল কারণ। একটু জাগ্রত জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় যেসব বিষয় স্থান কাল-পাত্র ভেদে

পরিবর্তনশীল যেমন খাদ্য বস্ত্র, পোশাক পরিচ্ছদ, চলাচলের বাহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হুজুর ﷺ কিন্তু রীতি-নীতি দিয়েছেন যা অনুসরণ করলেই প্রকৃত সুন্নত পালন হবে। যা কিয়ামাত পর্যন্ত সকল স্থানে কার্যকর থাকবে। যেমন রাসূল ﷺ বিশেষ ভঙ্গিতে খেতে বসতেন, দস্তরখানে খেতেন, তিন আঙ্গুলে সাধারণত আহার করতেন, ক্ষুধা রেখে খাদ্য গ্রহণ সমাপ্ত করতেন ইত্যাদি এবং টিলেটোলা পোশাক পড়তে বলেছেন। নিষেধ করেছেন নিখাদ লাল, গেরুয়া রঙ্গের (পুরুষের ক্ষেত্রে) রেশমের পোশাক, স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করতে, বিধর্মীর অনুকরণে পোশাক পরিধান করতে এবং পুরুষ হয়ে নারীর অনুরূপ এবং নারী হয়ে পুরুষের অনুরূপ পোশাক পড়তে নিষেধ করেছেন ইত্যাদি পালন করা কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব।

যেহেতু এসব সুন্নত পালন করা নফল (নিষেধাজ্ঞাগুলো বাদে) তাই কেউ না পালন করলেও গুনাহগার হবে না। সুন্নত পালনের অপরীসিম গুরুত্ব বোঝাতে পরিশেষে রাসূল ﷺ-এর সেই বাণী উদ্ধৃত করে ভূমিকার ইতি টানতে চাই। রাসূল ﷺ বলেন :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما

كتاب الله وسنتي

আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি- তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না যত দিন এই দুটি বস্তু আঁকড়ে ধরে থাকবে (পরিপূর্ণভাবে মানবে ও অনুসরণ করবে) তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নত (যেসব বাধ্যতামূলক)।” (মুয়াত্তা, কুদর অধ্যায় ৫৬১ পৃষ্ঠা, দিল্লী ছাপা)

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের কুরআন ও সহীহ হাদীসের তথা খাঁটি সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে একজন খাঁটি সুন্নতের মু‘মিন মুসলিম মুজাহিদ হিসেবে জীবন যাপন করার তাওফিক দান করুন- আমীন।

পর্ব- ২

ভূমিকায় আমরা সুন্নতের অনুসরণে পারলৌকিক কিছু কল্যাণ এবং এহতে বিমুখ হওয়ার পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি এসব আমরা সুন্নাত পালনের

ইহলৌকিক কল্যাণ জানতে সচেতন হবো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাসূল ﷺ প্রত্যেকটি কথা ও কাজের অনুসরণ যে শুধু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ বয়ে আনে মানব জীবনে তাই নয়, তা একান্ত বিজ্ঞান সম্মতও বটে। এ থেকে এবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে, রাসূল ﷺ-এর প্রত্যেক দ্বীনি কথা ও কাজ মহাজ্ঞানী রাক্বুল আলামীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

টাখনুর উপর কাপড় পরিধান করা

পুরুষদের জন্য টাখনুর নীচে অহঙ্কার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম। এ ধরনের ব্যক্তিদের দিকে আল্লাহ তা‘আলা হাশরের ময়দানে তাকাবেন না। আর টাখনুর নীচের বস্ত্র কর্তৃক আবৃত অংশ জাহান্নামে যাবে। এ ধরনের অহঙ্কারী ব্যক্তিদের জন্য আরেকটি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে। সম্প্রতি আমেরিকার মিসিগান স্টেটে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, পুরুষরা টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধমনী আবৃত থাকে, যার ফলে টাকনু ফুলে যাওয়া, যকৃতে সমস্যা এবং উন্মাদনা রোগ দেখা দেয়।

পক্ষান্তরে মহিলারা টাখনুর উপর কাপড় পরিধান করলে নারীজনিত হরমোনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে কোমর ব্যথা স্নায়বিক দুর্বলতা রোগ দেখা দেয়।

তা এ ব্যাপারটা স্পষ্ট যে, আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে রাসূল ﷺ যা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন তা যে শুধু আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধিতে সহায়ক তাই নয় পার্থিব জীবনেও অনেক কল্যাণ বয়ে আনে।

দাড়ি ছেড়ে দেয়া

দাড়ি ছেড়ে দেয়া এবং গৌফ ছোট রাখা প্রত্যেক পুরুষের জন্য ওয়াজিব। কেউ এর বিপরীত করলে পরকালীন জীবনে রয়েছে শাস্তি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায়ও জানা যায় যারা দাড়ি মুগুন করার মতো গর্হিত কাজ করে ফেলে তাদের দুনিয়ার জীবনেও অনেক ভোগান্তির শিকার হতে হয় যা তাদের প্রায় সবারই অজানা থেকে যায়। পুরুষ মানুষের যৌবন সমাগমে মুখমণ্ডলে অ্যানড্রোজেন নামক হরমোন এর

প্রভাবে দাড়ি গোঁফ গজায়। নিয়মিত দাড়ি মুগুন করলে মুখের ত্বকে দাগ পড়ে যায়। ধীরে ধীরে মুখের ত্বকের স্পর্শকাতরতা কমে যায়। ট্রাইজেমিনাল নামে একটি মিশ্র স্নায়ু মস্তিষ্ক হতে উৎপন্ন হয়ে মুখমণ্ডলে বিস্তৃত হয়। সমস্ত মুখমণ্ডল ও মুখগহ্বরের দু'পাটি দাঁতে এরা সংবেদনশীল। এইনার্ভ বা স্নায়ুর তিনটি শাখা রয়েছে— (১) অফথ্যালমিক (২) ম্যাক্সিলারী (৩) ম্যান্ডিবুলার।*

একই উৎস বা মূল হতে উৎপত্তির কারণে এরা একে অন্যের প্রতি খুবই সংবেদনশীল। নাকে ম্যাক্সিলারী এবং চোখে অফথ্যালমিক শাখা বিস্তৃত এবং ম্যান্ডিবুলার শাখাটি দু'চোয়ালে তথা গালজুড়ে বিস্তৃত। একটির উত্তেজনায় (ইরিটেশনে) অন্যটিও উত্তেজিত হয়। দাড়ি মুগুন করলে ম্যাক্সিলারী নার্ভ বিশেষ করে ম্যান্ডিবুলার শাখাগুলো উত্তেজিত তথা উৎপিড়িত হয়। ফলে অফথ্যালমিক শাখাটিও প্যাথেটিক্যালী উত্তেজিত হয়, এর ফলে দাড়ি মুগুনকালীন বা এমনি সময় অনেক ক্ষেত্রে চোখ দিয়ে পানি পড়তে দেখা যায়। দীর্ঘকাল এই প্রক্রিয়া চালু থাকলে দৃষ্টিশক্তির নানারূপ ত্রুটি দেখা দিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত দাড়ি মুগুন করলে কোন বিষয়ে গভীর চিন্তাকরার শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পায়। এছাড়া দাড়ি মুগুনের ফলে নার্ভসিস্টেমের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় পুরুষালী হরমোনের অস্বাভাবিক ক্ষরণ হয় ফলে অকাল যৌবন ও অকাল বার্ধক্য নেমে আসতে পারে। একইসাথে স্নায়ুর সহনশীলতা কমে যাওয়ায় প্রজনন ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে।

গোঁফ যদি এমন বড় থাকে যে, পানি পান করলে গোঁফ ভিজে যায় তবে সেরকম গোঁফ রাখা হারাম, এর চেয়ে ছোট রাখতে হবে। কারণ নিঃস্বাস ত্যাগের সময় নাসারন্ধ্র হতে অসংখ্য রোগ জীবানু আটকে থাকে এবং পানীয় পান করার সময় তা অন্ত্রে গিয়ে রোগ ব্যধির কারণ হয়।

অথচ বিধিমত দাড়ি রাখলে পুরুষের চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, প্রজনন ক্ষমতা অনেক দিন অটুট থাকে, চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, গলার উপরের অংশ হতে থুতনির নীচ পর্যন্ত অংশটি গরম থাকে ফলে কাশি লাগার আশঙ্কা হ্রাস পায়, টনসিলাইটিস, ফেরিনজাইটিস, লেরিনজাইটিস ইত্যাদি রোগের সম্ভাবনাও কমে যায়।

(চলবে.....)

জাগো মুজাহিদ

(তিতুমীর)

মুজাহিদ তুমি উঠো জেগে; আছে কেন বসে
তোমার সত্যের মহাবানী দাও বাতিলের কোল ঘেসে
তুমি অমর, তুমি বীর, তুমি যে অজয়,
তোমার শক্তিকে করতে পারবেনা কেও পরাজয়।
ইসলামের বাঁধে ভাঙ্গন ধরেছে তাকে স্বাধীন কর,
বসে আর না থেকে উঠে A K - 47 ধর।
মুসলমানেরা লাঞ্ছনা আজও মর্মে মর্মে সহিছে,
বুঝেছি তাই আজ তোমার গায়ে আঘাত পেয়েছে।
সত্যিই যদি তুমি আঘাত পেয়ে থাক,
তোমার শক্তি উঠুক উত্তাল সমুদ্রের মত।
তোমার কাফেলা জেলে বিশ্বের সিংহ দ্বারে কর আলোড়িত,
ভেঙ্গে ফেলে শিরুক ও বিদআত তাওতি আইন আছে যত।
তুমি যে এককালে বিশ্বের দ্বারে উঠেছিলে মাথা চাড়া দিয়ে,
আজ তোমার সেই শক্তি কে নিয়েছে কেড়ে
হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি খৃষ্টান ও গান্ধারেরা এক হয়ে,
বিড়াল হয়ে কেমনে তারা সিংহের মাথায় খেলা করে
তুমি কি ভুলে গেছো তোমার পূর্ব পুরুষদের পরিচয়,
তরবারী দ্বারা করেছিল যারা অর্ধ পৃথিবী বিজয়।
হে মুজাহিদ তুমি কি মা-বোনদের আর্তনাদ শুননা?
অলসতা ছেড়ে অস্ত্র তুলে, সামনের দিকে চলনা,
তুমি অস্ত্র নিয়ে ছুটে যাও হায়নাদের দিকে,
মাজলুম মা-বোনেরা তাকিয়ে আছে তোমার দিকে।।

আদ-দ্বীন

(সনেট)

আব্দুল্লাহ

হে মুসলিম! তুমি কি জাননা? আমার-
মহান রব প্রদত্ত জীবন বিধান,
চিরন্তন শাস্ত্রত্ব দ্বীন অবিনশ্বর,
মানব সৃষ্টির সাথে যার আগমন।
যা পরিপূর্ণ করেছেন সর্ব সহায়-
মহান আল্লাহ কল্যাণে স্বীয় বান্দার।
তবে কেন দ্বীনের এত দুর্দশা? হায়!
অস্বীকার কর সীরাতুল মুস্তাকীমের।

বর্জন কর সকল তত্ত্ব মতবাদ
গণতন্ত্র, রাজ, সমাজতন্ত্র সকল।
আরো যত মতবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ
প্রতিষ্ঠা কর সত্য দ্বীন সদলবল।

নেই সার্বভৌমত্ব আল্লাহ ব্যতীত
জিহাদ বৈ কোন পন্থা হবেনা গৃহীত।।

হক-বাতিলের লড়াই প্রেক্ষিতঃ ভোটের স্বরূপ- পবিত্র আমানত, না শিরকের স্বীকৃতি

নির্বাচনে ভোট দান অতি গুরুত্বপূর্ণ আমানত। আমাদের দ্বীন, ইমান, আকীদা, ইজ্জত-আব্র, শান্তি ও নিরাপত্তা দেশের স্বাধীনতা..... মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী জীবনবোধকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে খুব ভেবে চিন্তে ভোটের এই পবিত্র আমানত সত্যিকারের সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকের হাতে তুলে দিতে হবে....."। (সম্পাদকীয়, আহলে হাদীস দর্পণ, অক্টোবর-নভেম্বর- ২০০৩) দুনিয়ার অনেক দেশে ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বিচার্য বিষয় হলো, মুসলিম জাতিসত্তার মূল্য বোধ সম্পর্কে। মুসলিম জাতি অন্যান্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ জাতির ইচ্ছা স্বাধীনতা, যথেষ্টাচার নয়। অর্থাৎ ইসলামী আইন-কানুনে এজাতির ইচ্ছা-স্বাধীনতা শক্ত শিকলে বাঁধা। যারা এ শিকল ছিন্ন করে মুক্ত স্বাধীন জীবন-যাপন করতে চায় তারা মূলতঃ ত্বাগুত বা শয়তানের ইবাদতে লিপ্ত। দেশের জন্য সরকার নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মুসলিমদের জন্য অবশ্যই তা ইসলামী আইনের অধীন হতে হবে। নচেৎ তা হবে ত্বাগুতের অনুসরণ। এ বিষয়ে ইসলামী দিক নির্দেশনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক হলো : (১) তা শিরক-কুফর থেকে মুক্ত হতে হবে। (২) পদের জন্য কেউ প্রার্থী হতে পারবে না। (৩) নারীকে এসকল পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না। (৪) আসাবিয়াত বা দলীয় পক্ষপাতিত্বের উদ্ভাবন করা যাবে না। (৫) সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত সত্য-ন্যায়ের মাপকাঠি হবে না। এখন প্রচলিত নির্বাচন বা ভোট প্রথার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে উপরোক্ত সব কয়টি শর্ত থেকে তা মুক্ত। অর্থাৎ ইসলামের মুকাবিলায় মানব রচিত দ্বীন বা জীবন বিধান "গণতন্ত্রের" উপর ভোট প্রথা প্রতিষ্ঠিত। যেমন, আসাবিয়াত বা দলীয় পক্ষপাতিত্ব দ্বারা ভোট পরিচালনা, প্রার্থী হওয়া এতে আবশ্যিক,

নারীর জন্যও তা বৈধ, জাহিলী সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতি এর সত্য-ন্যায়ের মাপকাঠি। ইসলাম এসব কয়টির বিরুদ্ধেই সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেছে। যেমন বলা হয়েছে, "যারা আসাবিয়াত বা দলীয় পক্ষপাতিত্বের দিকে মানুষকে ডাকে কিংবা তার উপর লড়াই করে অথবা তার সমর্থনে মৃত্যুবরণ করে তারা কেউ আমাদের (মুসলিম দলভুক্ত) নয়।" (আবু দাউদ, মিশকাত- অহঙ্কার ও পক্ষপাতিত্ব পরিচ্ছেদ)। অতঃপর যে পদের প্রার্থী হয় তাকে পদ না দেয়ার নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! আমরা এমন লোকের উপর এ কাজের দায়িত্ব দেই না, যে তার প্রার্থী হয় অথবা অন্তরে এর আকাঙ্ক্ষা রাখে।" (বুখারী, মুসলিম, রিয়াদুস সলিহীন, অনুচ্ছেদঃ যে পদের প্রার্থী হয় তাকে পদ না দেয়ার নির্দেশ)। নারীকে পদ না দেয়ার নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "যে জাতি তাদের শাসনভার নারীর হাতে অর্পণ করে তারা কখনও সাফল্য লাভ করে না। (বুখারী, মুসলিম রমণী, আবু বকর জাবের আল জাযায়েরী, মদীনা)। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল" (সূরাঃ আন-নিসা- ৩৪)। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ন্যায়ের মাপকাঠি জাহেলী এ নীতি সম্বন্ধে ইরশাদ হচ্ছে, "যদি তুমি অধিকাংশ লোকের কথা শুনে কাজ কর, তবে ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে। কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণার অনুসরণ করে এবং আন্দাজে কথা বলে....।" (সূরাঃ আল-আন-আম- ১১৬)। অতঃপর ইসলামের মূলভিত্তি যার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা না হলে একজন মানুষ কাফির মুশরিক-এ পরিণত হয় সেই তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ গণতন্ত্রী ভোট প্রথায় সরকার নির্বাচনে অনুপস্থিত। কারণ এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের নীতি হলো- রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণ সার্বভৌমত্বের মালিক। ফলে আইন তৈরীর ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। ইসলামের দৃষ্টিতে এ স্বাধীনতা সুস্পষ্ট শিরক। ইরশাদ হচ্ছে "আর তাদের কি এমন একদল শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে ঐ সমস্ত আইন প্রবর্তন করবে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।" (ভাবার্থ- সূরাঃ গু'রা- ২১) কিছু লোক মনে করে দেশে ইসলামী

আইন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যেই আমরা গণতন্ত্রী ভোট প্রণয় অংশগ্রহণ করি। এক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর আইনের বিরোধীতা না করলেই তো হলো। এটা তাদের জন্য একটি ধোকা বৈ আর কিছুই না। গণতন্ত্র একটি ত্রুটি। আর ত্রুটিতে অস্বীকার করার মধ্যেই রয়েছে ইমানের স্বীকৃতি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শির্ক ছাড়াও ভোটের অন্যান্য দিক ইসলামী নীতির পরিপন্থী, যা সুস্পষ্ট জাহেলীয়াত। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, “যে ব্যক্তি জাহিলীয়াতের আহ্বান দ্বারা মানুষকে আহ্বান করে সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে সিয়াম পালন করে, সলাত আদায় করে এবং মনে করে, সে একজন মুসলিম।” (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত-ইমারত অধ্যায়)। অতঃপর প্রচলিত ভোট তথা গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহর আইন প্রবর্তন করতে চাইলে তো শির্ক করা জরুরী। কেননা গণতন্ত্রের নীতিতে কোন আইন প্রবর্তন করতে হলে জনগণের সার্বভৌমত্ব তথা সংসদীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন আবশ্যিক যদিও তা আল্লাহর আইনও হয়। যেমন, গণতন্ত্রী পাকিস্তানী সংসদে বিগত এক সরকার সে দেশে সার্বিকভাবে আল্লাহর আইন প্রবর্তনের জন্য ২৮শে আগস্ট ৯৮-এ একটি ঘোষণা দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, উক্ত মহতী উদ্যোগ পার্লামেন্ট নাকচ করে দিলে সরকার (পুনর্বার) গণভোটের আশ্রয় নেবে। অর্থাৎ পাকিস্তানী জাতীয় পরিষদ ইসলামী আইনকে দেশের সর্বোচ্চ আইন করে একটি সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পাস করে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সিনেটে পাঠায়। সেখানে বিলটির উপর দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। সমর্থন পেলে আল্লাহর আইন বাস্তবে রূপ নিবে নচেৎ তা কিতাবের পাতায় অবস্থান করবে। শেষ পর্যন্ত সিনেট সদস্যদের বিশেষ বিবেচনায় পরীক্ষামূলক পাকিস্তানের একটি অঞ্চলের জন্য তথা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উপজাতীয় এলাকার জন্য বিলটি অনুমোদিত হয়। নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের এ নীতি মানুষকে আল্লাহ তা‘আলার সমকক্ষ স্থির করার নামান্তর যা সুস্পষ্ট শির্ক। কারণ আল্লাহর আইন স্বয়ংসম্পূর্ণ; কারো অনুমোদনের মুখাপেক্ষী নয়।

ইরশাদ হচ্ছে, “আল্লাহ তাঁর হুকুমের মধ্যে কাউকে শরীক করেন না।” (সূরাঃ কাহাফ- ২৬) বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আলিম সম্প্রদায়ের একটি বড় জামায়াত কুরআন মাজীদ-এর সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াত “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।” উল্লেখ পূর্বক প্রচলিত ভোটকে পবিত্র আমানতরূপে চিহ্নিত করতঃ দল বিশেষকে ভোট দেয়া জিহাদী কাজ বলে জনগণকে শির্ক-জাহিলী কাজে লিপ্ত করতে বেশ তৎপর যার একটি নমুনা প্রবন্ধের গুরুতেই আমরা উল্লেখ করেছি। প্রচলিত ভোট শির্কের স্বীকৃতি। যে ভোট দিল সে মূলতঃ মানুষকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে আইনদাতা বানানোর শির্কে লিপ্ত হলো। আর মনে করলো, আমি একটি জিহাদ করলাম। অথচ ইরশাদ হচ্ছে, “যদি তুমি শির্ক করো তবে তোমার সব আমল নষ্ট হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগস্তদের শামিল।” (সূরাঃ আয-যুমার- ৬৫) প্রকাশ্যে ধার্য যে, আমানত-এর সাধারণ অর্থ হলো, কারো নিকট গচ্ছিত অন্যের কাজ, দায়িত্ব অথবা বস্তু যা তার প্রাপকের নিকট অর্পণ করার বিষয়। বলাই বাহুল্য, যে কাজ বা বস্তু হারাম তা বর্জনীয় বিষয়, যদিও তা কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর নিকট গচ্ছিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে, “সৎ কর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনমূলক কাজে একে অন্যকে সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।” (সূরাঃ মায়দাহ ২) সুতরাং আমানত অর্পণ করা যদি কোন হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তা বর্জনীয় বিষয় হিসাবে হস্তান্তরযোগ্য আমানাতের শ্রেণীভুক্ত হয় না। ফলে তা প্রাপকের নিকট অর্পণ না করাই জরুরী হয়। যেমন এতিমের সম্পদ তার অভিভাবকের নিকট একটি পবিত্র আমানত। কিন্তু যদি সে সম্পদে মদ গচ্ছিত হয় তাহলে তা হকদারের নিকট অর্পণ না করাই জরুরী। সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী বলেন, “আমাদের নিকট কোন এক এতিমের কিছু মদ ছিল। (যখন মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়ে) সূরা আল-মায়িদা নাযিল হলো তখন আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম

এবং বললাম, এটাতো এতিমের সম্পদ। তিনি বললেন, তবুও ঢেলে ফেলো।” (তিরমিযী, মিশকাত, অধ্যায় মদ ও মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতি প্রদর্শন)। ভোট যা সরকার নির্বাচনের মাধ্যম, জনগণের নিকট বাহ্যতঃ তা আমানত মনে হলেও প্রকৃত অর্থে তা মোটেও আমানত নয়। কারণ ভোট শির্ক ও সংশ্লিষ্ট জাহিলীয়াতের ছদ্মনাম যা বর্জন করাই জরুরী। বর্তমানে মদের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে বলে যদি তাকে পবিত্র আমানত মনে করে তার সংরক্ষণ হস্তান্তর করা হয় তাহলে সেটা যে কুফরী, ইসলাম সম্বন্ধে একজন সাধারণ জ্ঞানীও তা বুঝে। কোন শির্ক কাজকে পবিত্র আমানত বললে তা আরো শক্ত কুফরী। সুতরাং জেনে-ওনে শির্কের স্বীকৃতি ভোটকে পবিত্র আমানত বলা শক্ত কুফরী তা বলাই বাহুল্য। মানুষ ভুল করে। আর ঐ ভুলকারীই উত্তম যে তার ভুল সংশোধন করে। সুতরাং এই বক্তব্যের দ্বারা যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন তাদের তাওবা করা উচিত, তারা ভোটকে পবিত্র আমানত জ্ঞান করে শির্ক-জাহিলীয়াতের মহা পাপে নিজেরা লিপ্ত হচ্ছে অন্যকেও লিপ্ত করেছে। বর্তমানে ইসলাম প্রচারের হিড়িক পড়ে গেছে বটে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তারা শির্ক-কুফর, বিদ্‌আত এবং জাহিলীয়াতেরও সেবা করেছে। সুতরাং অতি উৎসাহীদের ভেবে-চিন্তে কাজ করা দরকার যাতে কুরআন-এর দিকে মানুষকে ডাকতে যেয়ে প্রকারান্তরে কুরআনকে পিছনে ঠেলে দেয়ার কাজ না হয়। সাহাবী ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত, “তোমরা এমন সম্প্রদায় পাবে যারা মনে করবে যে, তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে মানুষকে ডাকছে (অথচ) প্রকৃতপক্ষে তারা তা পিছনে ঠেলে দেবে। (দারেমী, উছুলুল ইমান, মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আল-তামীমী)। অর্থাৎ খারাপ কাজকে প্রতিহত করার জন্য নিজে খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়া। ইসলামী কোন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শির্ক-কুফর-জাহিলীয়াত-এর মধ্যে লিপ্ত হওয়াকে জিহাদ মনে করা চরম মূর্থতা যদিও এরূপ মূর্থতার পিছনে থাকে জ্ঞানের বড় ডিগ্রী।

চলতি ঘটনা

ইরাকী মুজাহিদের জবানবন্দী

সামারা ছোট শহর। সুন্নী অধ্যুষিত তিকরিত, ফালুজা, রামাদি এবং মসুলের পাশ ঘেঁষেই এর অবস্থান। ঠিক এখানেই বাস করেন পঞ্চাশ ছুই ছুই সাদ্দাম শাসনামলের নীতিবান এক জেনারেল। পরনে ঐতিহ্যগত ঢিলে-ঢালা আরবী পোশাক। চোখে দুর্দান্ত-দুর্বিনীত আমেরিকা বিনাশী চাহনি। যেন তাকালেই ব্লাকহক কিংবা চিনুক হেলিকপ্টারের পাইলট গতিপথ ভুলে যাবে। আঁছড়ে পড়বে মসুলের নিষিদ্ধ ভূমিতে। তিনি আজ ইরাকী মুজাহিদ।

মার্কিনীদের বিরুদ্ধে বর্তমান হামলার ধরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, আক্রমণ এবং স্থান পরিবর্তন নীতিতে এখন মুজাহিদরা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সামারার প্রত্যেকটি বাড়ী এক একটি মুজাহিদ দূর্গ। প্রায় প্রত্যেকেই জানে কিভাবে অস্ত্র চালাতে হয়। শত্রুর মোকাবেলা করতে হয় এবং শত্রুকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে টেনে এনে ধ্বংস করতে হয়। এমনকি রকেট, প্রপেল, গ্রেনেড, মিসাইল নিক্ষেপ ও এ্যান্টি ট্যাংক কামান ব্যবহারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে অনেকের। উল্লেখ্য, সাদ্দাম শাসনামলে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ার কারণে ঘরে ঘরে সবাই যোদ্ধা।

মুজাহিদদের সংখ্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, ইরাকি প্রত্যেকটি পরিবার এক একটি মুজাহিদ ইউনিট এবং উক্ত ইউনিট পরিচালিত হয় পরিবারের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ-যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে। অতঃপর সেই নেতৃত্বকে সমন্বয় করা হয় সামগ্রিক মুজাহিদ কর্মকাণ্ডের সাথে। সেখানে নারী-পুরুষ, শিশু সবাই কাফির দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে একাত্ম। সেখানে মুজাহিদদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বলা কঠিন এবং প্রতিদিন এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি পাশেই একটি পরিবারের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। চৌদ্দ জনই জিহাদী কাফেলার মর্দে মুজাহিদ। মুজাহিদদের অস্ত্র সম্পর্কে বলেন, তাঁর গ্রুপের সদস্যদের হাতে মেশিন গান, মর্টার, রকেট প্রপেল গ্রেনেড, এস.পি.জি- ৯ এ্যান্টি ট্যাংক মিসাইল এবং স্ট্রিলা এ্যান্টিএয়ারক্রাফট মিসাইল বিদ্যমান। সর্বোপরি মুজাহিদদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে তাদের ঈমান।

ঠিক এ সময় হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেন মুজাহিদ নেতা। আর মাত্র আধ ঘণ্টা। বাইরে অপেক্ষমান অপর আট সঙ্গী। ছুটে চলেন তিকরিত সামারা মহা সড়কের পাশে। এ্যামবুশ। উর্ধ্বাঙ্গে এগিয়ে আসছে একটি মার্কিন কনভয়। তৎপর মুজাহিদ। এ্যাকশন। নিহত ও আহত কাফির কনভয় ফিরে পালাতে চায়। আবার এ্যাকশন। মুহূর্তে মিলিয়ে যায় মুজাহিদ। আক্রমণ এবং স্থান পরিবর্তন নীতির বাস্তব প্রয়োগ। এভাবেই সাবেক জেনারেল সামারার মুজাহিদ নেতা বর্ণনা করলেন, ৯ নভেম্বর ০৩ তিকরিত সামারা মহাসড়কে আমেরিকান কনভয়ের উপর হামলার দৃশ্যপট। তিনি আরো বলেন, এ মাটি থেকে মার্কিনীদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত জিহাদ চলবে।

মু'মিনের গুণাবলী ও নিদর্শন

আবু জাফর

মহান আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর এই পৃথিবীর মাঝে যত কিছু আছে সমস্ত কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিগুলোর মাঝে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর এই শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে থেকে যারা যারা মু'মিন হবে তাদের গুণাবলী সম্পর্কে তিনি তারা পাক কালামে বর্ণনা করেছেন। মু'মিনের গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে মু'মিন কাকে বলে সে সম্পর্কে আলোচনা করছি। মু'মিন- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ উপর ঈমান আনে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত সমূদয় ওয়াহী (ওয়াহীয়ে মাতলু- কুরআনের প্রত্যেক আয়াত এবং ওয়াহীয়ে গায়রে মাতলু- প্রমাণিত প্রত্যেক সহীহ হাদীস)-কে সত্য জেনে অন্তরে বিশ্বাস করে সেই অনুযায়ী সুন্নাত তরিকায় আমল করে আর এসবের মৌখিক স্বীকারোক্তি দেয় এবং নিফাক ও ইরতিদাকে লিগু থাকে না, তাকে মু'মিন বলে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের গুণাবলী সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন তার মধ্যে থেকে সংক্ষিপ্তাকারে মু'মিনের গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করছি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله

اولئك هم الصدقون *

অর্থাৎ : “প্রকৃতপক্ষে মু'মিনতো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) প্রতি ঈমান এনেছে অতঃপর সন্দেহ করেনা এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ লোক।” (সূরা হুজরাত-১৫) এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের কথা বললেন যে, তারা এমনই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের(স)

উপর ঈমান আনে, আর ঈমান আনার পর কোনই সন্দেহ পোষণ করে না এবং সেই সাথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর জমিনে তার দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য আশ্রয় প্রচেষ্টা চালায়। অর্থাৎ জিহাদ করে। তারাই হচ্ছে সত্যবাদী মু'মিন লোক।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

انما المؤمنون الذين اذا ذكروا الله

..... هم المؤمنون حقاً *

অর্থাৎ- “যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ার দিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুজী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার।” (সূরাঃ আল-আনফাল-২-৪) আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তাদের সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে। অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর যার দাবি হলো, ভয় ও ভীতি। কুরআনের অন্য এক আয়াতে তারই আলোচনাক্রমে আল্লাহ প্রেমিকদিগকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে-

(হে নবী)! সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, সমস্ত বিনয়ী কোমল প্রাণ লোকদের, যাদের অন্তর তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হয়। এতদুভয় আয়াতে আল্লাহর আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহর এই জিকিরের বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে-

الا بذكر الله تطمئن القلوب *

অর্থাৎ- “আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে তা মনের প্রশান্তি

এবং শান্তির পরিপন্থী। যেমন হিংস্র জীব-জন্তু কিংবা শত্রুর ভয় মানুষের প্রশান্তিকে ধ্বংস করে দেয়, আল্লাহর যিকিরের দরুণ অন্তরে ভয় তা থেকে শব্দটি ব্যবহার করা خوف আলাদা। সেজন্য এখানে শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ وجل হয়নি। সাধারণ ভয় নয়, বরং এমন ভয়, যা বড়ত্বের মহত্বের কারণে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এখানে আল্লাহর জিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করছিল, তখন আল্লাহর কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইলো। এক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আযাবের ভয়। (বাহরে মুহীত) আর এখানে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি। মু'মিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তার ঈমান বেড়ে যায়। সমস্ত আলেম, তাফসীরবিদ ও হাদীসবিদগণের সর্বসম্মত মত এই যে ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো, ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয় যাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা ঘৃণার উদ্ভব হয়। যার ফলে সে তার কছে ও যেতে পারে না। সুতরাং একজন মু'মিনের গুণ বৈশিষ্ট্য এমন থাকা উচিত যে, তার সামনে যখন আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হবে, তখন তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে। তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎ কর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, সাধারণ লোকজনেরা যেভাবে কুরআন পাঠ করে এবং শুনে, যাতে না থাকে কুরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোন খেয়াল, আর না থাকে আল্লাহর মহত্বের প্রতি খেয়াল। এখানে সে ধরনের উদ্দেশ্য নয় এবং এতে উচ্চতর ফলও সৃষ্টি হয়। আয়াতে তৃতীয় গুণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি ভরসা

করা। বলা হয়েছে যে, তারা এমনই যে, তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে। তাওয়াক্কুল অর্থ হলো, আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে একমাত্র একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার উপর। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এর অর্থ এই নয় যে, স্বীয় প্রয়োজনের জন্য জড় উপকরণ এবং চেষ্টাচরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকা। বরং এর অর্থ হলো এই যে, বাহ্যিক জড় উপকরণই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট মনে না করা বরং নিজের সমর্থ ও সাহস অনুযায়ী জড় উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণ তারই সৃষ্টি এবং উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে আছে যে, স্বীয় জিকির ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য মাঝামাঝি পর্যায়ের অবশেষণ এবং জড়-উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন মস্তিষ্ককে শুধুমাত্র স্থূল প্রচেষ্টা ও জড় উপকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখোনা। মু'মিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, সলাত প্রতিষ্ঠা করা। বলা হয়েছে শব্দের إقامة সলাত প্রতিষ্ঠা করা, সলাত পড়া নয়। আভিধানিক অর্থ হলো, কোন কিছুকে সোজা দাড় এর সারমর্ম হচ্ছে إقامة الصلاة। কাজেই সলাতের যাবতীয় আদব-কায়দা রীতি-নীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমনভাবে রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা ও শর্তাশর্তের কোন রকম ত্রুটি হলে তাকে সলাত পড়া বলা গেলেও সলাত প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। পঞ্চম গুণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাহে ব্যয় করা। বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাকে যে রিজিক দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহর পথে আল্লাহ তা'আলার রাহে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে আল্লাহর দীন বাস্তবায়ন করার কাজে ব্যয় করা এবং

শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত ফিতরা প্রভৃতি নফল দান খয়রাতসহ মেহমানদারী বড়দের কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের প্রকৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব রকমের দান খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত। উপরের আয়াতে মু'মিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আর

পরে বলা হয়েছে-
 ۞ اٰمَنَ كُلُّ لَوْحٍ هَلَا سَتِيكَارِ مُؤْمِنٍ،
 يَادِرِ ۞ وَبَايِرِ اَكْهَرِ اَبْوَ ۞ وَ اَبْوَ ۞ وَ اَبْوَ ۞
 لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 ۞ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُكَ مِنْ اَلْحَرَمِ ۞

অর্থ-এমন সব লোকই হলো সত্যিকার মু'মিন, যাদের ভেতর ও বাইরে একইরূপ এবং মুখ ও অন্তর একইরূপ। আর এরাই এইসাক্ষ্য দিয়ে থাকে-
 لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
 ۞ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُكَ مِنْ اَلْحَرَمِ ۞

অর্থ- “বলুন! আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান দিব? যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট রয়েছে তাদের জন্য বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।” (সূরাঃ আলে-ইমরান-১৫) উপরের আয়াতের বাখ্যায় বলা হয়েছে, যারা দুনিয়ায় অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরো উৎকৃষ্টতর নেয়ামতের সন্ধান বলে দিচ্ছি। যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা আল্লাহর আনুগত্য করে তারাই এ নিয়ামত পাবে। সে নিয়ামত হচ্ছে সবুজ বৃক্ষলতাপূর্ণ বেহেশত যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিসমূহ প্রবাহিত হবে। তাতে থাকবে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ اٰمَنُوا يَقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا
 يَقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَمَنْ يَّقَاتِلْهُ اُولٰٓئِٕكَ
 الشَّيْطٰنُ ۞

অর্থ- যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে

শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে।” (সূরাঃ আন-নিসা-৭৬) আল্লাহ তা'আলা মু'মিনকে লক্ষ্য করে উপরের আয়াতে বললেন, যারা মু'মিন বা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা মু'মিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিতের লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তার যাবতীয় বিধিবিধান নির্ভেজাল ও ন্যায় ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্ব শান্তির জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য, যাকে আল্লাহর কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মু'মিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন তার সামনে এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কাফিরের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শির্কী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শির্কী যেহেতু শয়তানের পথ সুতরাং কাফিররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন :

يَقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ
 ۞ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُكَ مِنْ اَلْحَرَمِ ۞
 ۞ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُكَ مِنْ اَلْحَرَمِ ۞
 ১১১ নং আয়াতের উপর অংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে। কেননা তারা অর্থায় মু'মিনেরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। অতঃপর মারে ও মরে। এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের গুণের কথা বললেন যে, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে। উপরের আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মু'মিনগণ আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর এই জিহাদ করার কারণেই তারা পাবে জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের গুণাবলী সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন। তার মধ্য থেকে কয়েকটি গুণের কথা আলোচনা করলাম। তাই আশা করি আমরা এ থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবো। আল্লাহ আমাদের সকলকেই মু'মিনের গুণাগুণ ও নিদর্শনগুলো পালন করার তাওফীক দান করুন- আমীন।



তুর্কী ইঞ্জিনিয়ারের বিনিময়ে তালিবান বন্দীদের মুক্তি দাবী

আফগানিস্তানে তালিবান মুজাহিদরা তাদের হস্ত
গত একজন তুর্কী ইঞ্জিনিয়ারের বদলে আড়াইশ' তালিবান সমর্থকের মুক্তি দাবী করেছে। তালিবান কমান্ডার আব্দুল ওয়ারিস মুসলিম বিবিসিকে বলেন, তাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তুর্কী লোকটি আটক থাকবে। তালিবান কমান্ডার বলেন, মার্কিন ও আফগান বন্দীশালায় আমাদের ভাইয়েরা যে অমানবিক পরিস্থিতিতে দিনাতিপাত করছে তার পরিবর্তে আমরা সদাচরণ হিসেবে ঐ ইঞ্জিনিয়ারের কোন ক্ষতি করবো না। বরং তাকে তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য শক্তিশালী স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করতে দেয়া হচ্ছে। আফগান সরকার এখনো এ ব্যাপারে কোন সমঝোতার উদ্যোগ নেয়নি। তুর্কী ইঞ্জিনিয়ারের জীবন বাঁচাতে কারজাই সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ তালিবান শক্তির পুনরুত্থানকে আলোকিত করবে।

আফগানিস্তানে মাইন বিস্ফোরণে ৩ মার্কিন সৈন্য নিহত

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে মাইন বিস্ফোরণে ৩ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। তালিবান বাহিনীর পেতে রাখা মাইনের উপর দিয়ে গাড়ীতে করে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণে ওই ৩ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। একজন শীর্ষ আফগান কর্মকর্তা একথা জানান। কিন্তু মার্কিন সামরিক বাহিনী বলেছে, মাইন বিস্ফোরণে শুধুমাত্র ১জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। কুনার প্রদেশের মানেগী জেলার ১টি মার্কিন সামরিক ঘাঁটির কাছে এই মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। কুনার প্রদেশের গভর্নর সৈয়দ ফজল আকবর বলেন, মার্কিন সৈন্যবাহী গাড়ীটি নতুন করে পেতে রাখা একটি মাইনের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ওই বিস্ফোরণ ঘটে এবং গাড়ীর ৩ জন মার্কিন সৈন্য নিহত ও তাদের গাড়ী পুরোপুরিই ধ্বংস হয়।

চেচনিয়ায় সংঘর্ষে ৫ রুশ সৈন্য নিহত

চেচনিয়ায় নিত্যনৈমিত্তিক দিনের ন্যায় আবারও তুমুল সংঘর্ষ ও স্থল মাইন বিস্ফোরণে পাঁচজন রুশ সৈন্য নিহত হয়েছে। মস্কো নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণাঞ্চলীয় চেচনীয় প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা রবিবার এ কথা জানান। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই কর্মকর্তা জানান, গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চেচনীয় মুজাহিদদের অব্যাহত ত্বরিত আক্রমণে ও মাইন বিস্ফোরণের ফলে পাঁচজন রুশ সৈন্য নিহত ও বারজন আহত হয়েছে। রুশ বাহিনী মুজাহিদদের অবস্থান লক্ষ্য করে গ্রোজনির বিভিন্ন স্থানে গোলাবর্ষণ করে। কিন্তু মুজাহিদ পক্ষে কোন ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ জানা যায়নি বলে ওই কর্মকর্তা জানান। নিহত পাঁচ রুশ সৈন্যের মধ্যে দুজন তাদের অবস্থানের উপর বিভিন্ন আক্রমণে, একজন সৈন্য মাইন অপসারণের চেষ্টাকালে এবং অপর দু'জন সৈন্য দক্ষিণের শহর ভেভিলোতে মুজাহিদদের সাথে সংঘর্ষকালে নিহত হয়।

কারজাই সরকারের সঙ্গে তালিবানদের
কথিত আলোচনা অনুষ্ঠান,
তালিবানদের অস্বীকৃতি

কারজাই সরকারের সাথে আমাদের কোন আলোচনা
অনুষ্ঠিত হয়নি।

তালেবান মুখপাত্র।

কারজাই সরকারের সঙ্গে কোন তালিবান নেতার মার্কিন পরবর্তী শাসণ ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের যে খবর প্রকাশিত হয়েছে; একজন তালেবান মুখপাত্র তা দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিয়েছেন।

একটি ফ্যাক্স বার্তায় তালেবান মুখপাত্র হামিদ আগা বলেন- “আফগান ভাঁবেদার সরকারের সাথে আমরা কোন আলোচনা করিনি। পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার জন্য এটা কাবুল সরকারের একটা চাল মাত্র। তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি সপ্তাহগুলোতে ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বাধীন পুতুল সরকারের সংগে তালেবান নেতাদের অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের ঘটনা

বিন্দুমাত্র সত্য নয়। বস্তুতঃ তালিবানরা কাবুল সরকারের সঙ্গে কোন শান্তি আলোচনা করবেও না, কারণ তাদের কোন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই।

তিনি জানান, এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে, কোন তালিবান নেতা সরকারের সঙ্গে এমন যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে সম্মত হবেন যাতে আফগান জনগণের কোন কল্যাণ নেই। মূলতঃ কারজাই ও তার সমর্থকেরা এই অনুষ্ঠানকে পুঁজি করে আসন্ন নির্বাচনে লাভবান হতে চায়।

কারজাই সরকার জনগনকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তালেবান ও তাঁদের অনুসারীরা তাদের সাথে হাত মেলানো ও সংঘবদ্ধ হওয়াকে কোন গুরুত্বই দেয় না, যারা আমেরিকানদের দ্বারা ক্ষমতায় এসেছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, কারজাই সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে জনগণের কোন লাভ নেই এবং এটা তাদের সমস্যা সমাধানের কোন পথও নয়। আরো বলেন, গুরু থেকেই তার স্বপ্ন ছিল আফগানিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা যা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবনা যদি তালিবানরা এমন কারো সাথে জোট গঠন করে যারা আমেরিকান সামরিক শক্তি দ্বারা জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, কারজাই সরকারের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান ছিল একটি অহেতুক প্রচারণা যা চরম অসততা ও আফগান মুসলিম জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর।

ভিয়েতনামের তুলনায় ৮মাসে বেশী মার্কিন সৈন্য নিহত

রয়টার্স : ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রথম তিন বছরের তুলনায় ইরাকের মার্কিন সৈন্যদের মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে রয়টার্সের এক বিশ্লেষণে বৃহস্পতিবার দেখানো হয় যে, ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে সেখানে ৩৯২ জন মার্কিন সৈন্য নিহত

হয়। তখন ইন্দোচীনে ১৭ হাজারের অধিক মার্কিন সৈন্য ছিল।

এতে বলা হয়, বুধবার বাগদাদে বোমা বিস্ফোরণে এক মার্কিন সৈন্যের নিহত হওয়ার মধ্যদিয়ে ইরাকে মার্কিন সৈন্যের মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯৭ জনে। ভিয়েতনামে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে। অথচ ইরাকে মার্কিন সৈন্য রয়েছে এক লাখ ৩০ হাজার।

গত ২০ মার্চ অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম শুরু হওয়ার পর গত রবিবার ইরাকে হতাহতের সংখ্যা ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে গেছে।

ইরাকে ৫ হাজার প্রতিরোধ যোদ্ধা

লড়ছে : যুক্তরাষ্ট্র

রয়টার্স : ইরাকে মার্কিন ও কোয়ালিশন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সংখ্যা ৫ হাজারের বেশী নয়, তবে তাদের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ডের প্রধান গত বৃহস্পতিবার একথা বলেন। ইতিপূর্বে মার্কিন কর্মকর্তারা এই প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সংখ্যা এবং তাদের কাজের ধরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। ইরাকে মার্কিন ও কোয়ালিশন সেনা এবং অন্যান্য লক্ষ্যস্থলের উপর রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ আক্রমণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার নাসিরিয়ায় একটি ইতালীয় সামরিক পুলিশ ঘাঁটিতে ভয়াবহ আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ১৮ জন ইতালীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়।

জেনারেল জন আবিজায়িদ ফ্লোরিডার টামপায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে সক্রিয়ভাবে লড়ছে এমন লোকের সংখ্যা ঠিক ৫ হাজার হবে না।

ইরাকে বর্তমানে প্রায় ১লাখ ৩০ হাজার মার্কিন সৈন্য এবং ২৫ হাজার বৃটিশ, পোলিশ, ইতালীয় ও অন্যান্য দেশের সৈন্য রয়েছে। এক উর্ধ্বতন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানান, জেনারেল আবিজায়িদ টাম্পা কেন্দ্রীয় কমান্ড সদর দফতর থেকে আগামী সপ্তাহে তার কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে কাতার আসবেন। এটিকে তিনি তার অপারেশনের ঘাঁটি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করছেন বলে সূত্র জানায়।

ইরাকে আক্রমণ কোয়ালিশনে ত্রাস সৃষ্টি করবে না

এএফপি : অস্ট্রেলিয়া ঘোষণা করেছে যে, ইরাকে মোতায়েন তার দু'টি বিমান আরো ৬মাস সেখানে অবস্থান করবে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড বলেছেন, সন্ত্রাসী হামলা বৃদ্ধি সত্ত্বেও মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশনে ত্রাস সৃষ্টি হবে না।

দক্ষিণ ইরাকে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৮ ইতালীয় ও ৯ ইরাকীর মৃত্যুর দু'দিন পর জন হাওয়ার্ড তার বক্তৃতায় বলেন, 'এই সর্বশেষ হত্যা খুনীদের বেপরোয়া চলমান সন্ত্রাসী আক্রমণের ঠিক আরেকটি নিদর্শন মাত্র।'

হাওয়ার্ড লন্ডনে জাতীয় বেতারকে বলেন, 'বাদবাকি বিশ্ব যদি এহেন ত্রাসের কাছেরি স্বীকার করে তবে তা বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার সন্ত্রাসীদের কাছে এই বার্তাই পৌঁছাবে যে, তুমি যদি এটা ধারণা করো তবে বিজয়ী হবে।'

এদিকে অস্ট্রেলিয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট হিল বলেছেন, দু'টি রয়েল অস্ট্রেলিয়া এয়ার ফোর্স (আরএএএফ) বিমান আরো ৬ মাস মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করবে।

নাসিরিয়ায় ইতালীর ঘাঁটিতে ভয়াবহ বোমা হামলা

উত্তর ও পশ্চিম ইরাকের বিস্তীর্ণ সীমানা অতিক্রম করে গতকাল ইরাকী গেরিলারা ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে দক্ষিণ ইরাকের বহুল আলোচিত শহর নাসিরিয়ায়। ইরাক যুদ্ধের সময়কার ভয়ংকরতম রণক্ষেত্র, নাসিরিয়ায় মোতায়েন ইতালীয় বাহিনীর প্রধান ঘাঁটিতে পরিচালিত এই ট্রাক বোমা হামলায় ১৭ ইতালীয় সৈন্য এবং ৮জন ইরাকী নিহত হয়েছে। এই ঘাঁটিতে রোমানিয়ার সেন্যরা অবস্থান করলেও তারা এবারের মতো হামলা থেকে বেঁচে যায়। শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণে প্রধান সেনাঘাঁটির মূল ভবনের একাংশ ধসে পড়ে এবং বাকি অংশে ও নিকটবর্তী গাড়ী পার্কিংয়ে আগুন ধরে যায়। এতে আহত হয়েছে ইতালীয় সৈন্যসহ ১৫জন। ভবনের ধ্বংসপ্রাপ্তির নীচে আরো লাশ থাকতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

হামলার খবর শোনার পর গভীর শোকের ছায় নেমে আসে ইতালীতে। নিহত সৈন্যদের ব্যাপারে শোক প্রকাশের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পার্লামেন্ট মূলতবী ঘোষণা করা হয়। একই সাথে ইতালীর বার্লস্কোনি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সেদেশে বিরোধী দলগুলো অবিলম্বে নিরাপত্তাহীন ইরাক থেকে সৈন্য ফিরিয়ে আনার দাবী জানিয়েছে। কিন্তু তার দাবীর প্রতি কর্ণপাত না করে ইতালীর প্রেসিডেন্ট কার্লো এজেগলিও চিয়াম্পি এবং প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুস্কোনি ইরাকীদের গেরিলা হামলাকে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, হামলা সত্ত্বেও ইতালীয় বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না। এদিকে, দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়মিত গেরিলা হামলার অংশ হিসেবে গতকাল রাজধানী বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তাজিক শহরের উপকণ্ঠে মার্কিন সৈন্যদের উপর বোমা হামলা চালানো হয়। এ সময় রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে টহলরত মার্কিন বাহিনীর এক সৈন্য নিহত হয়। একই দিন খোদ বাগদাদে গেরিলা হামলায় নিহত হয় অপর এক মার্কিন সৈন্য এবং ৪সৈন্য আহত হয়। এপি, এএফপি, রয়টার্স ও বিবিসি ইরাকে বিরামহীন গেরিলা হামলায় দখলদার পক্ষ হতাহতের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি এবং পরিস্থিতি পুনর্মূল্যায়নের জন্য গত মঙ্গলবার ইরাকে নিযুক্ত মার্কিন প্রতিনিধি-পল ব্রেমারকে জরুরী ভিত্তিতে হোয়াইট হাউসে তলব করা হয়। সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ডস্ রামসফেল্ড এবং প্রেসিডেন্ট বুশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কণ্ডোলিজা রাইস এবং অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা তার কাছে ইরাকের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং অন্তর্বর্তী প্রশাসনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য চান। এ সময় ব্রেমার অন্তর্বর্তী প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন যে, প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাদের প্রধান দায়িত্ব সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে ব্যর্থ হয়েছেন। এর ফলে ইরাকের ভবিষ্যৎ নির্বাচনও পিছিয়ে যাচ্ছে এবং একই সাথে পিছাচ্ছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা। ইরাকের

বর্তমান তাঁবেদার প্রশাসন সম্পর্কে ব্রেমার হতাশা প্রকাশ করেন। হোয়াইট হাউস সূত্র জানা, অন্তর্বর্তী ইরাক সরকারের কাছে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আফগানিস্তানের কারজাই সরকারের মত একটি অন্তর্বর্তী পুতুল সরকার ইরাকেও প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা বুশ প্রশাসন তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখছে।

ইরাকে মার্কিন পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, চরমপন্থীরা ইরাকে তালিবান-স্টাইলে সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, বিদেশী মুজাহিদরা এই লক্ষ্যে ইরাকে ঢুকে বাগদাদের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

স্থানীয় সময় সকাল ১০-৩০টার দিকে ফোয়াত নদীর তীরবর্তী নাসিরিয়া শহরে ইটালীয় বাহিনীর সদর দফতরে প্রথমবারের মত শক্তিশালী গাড়ী বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই সেনাঘাঁটিতে রোমানীয় সৈন্যদেরও অবস্থান ছিল। সকালের দিকে যখন হামলা চালানো হয় তখন ঘাঁটির অধিকাংশ সৈনিক সেখানে অবস্থান করছিল। যে কারণে হতাহতের সংখ্যা হয় ব্যাপক। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডে ইটালীর ২হাজার ৩০০ সৈন্য দক্ষিণ ইরাকে মোতায়েন রয়েছে। এদের অধিকাংশ হচ্ছে ইটালীর 'ক্যারাবিনারি' নামক সামরিক পুলিশ বাহিনীর সদস্য এই বাহিনী থেকেই সাধারণত ইটালী সরকার বিদেশে সেনা মোতায়েন করে থাকে। ক্যারাবিনারি'র এক মুখপাত্র গতকাল রোমে বলেছেন, শিয়া মুসলমান অধ্যুষিত দক্ষিণ ইরাকে ইটালীয় সেনাঘাঁটির সামনে পরিচালিত আত্মঘাতী হামলায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

হামলার পর শোকাহত ইটালীর প্রধান বিরোধী দলের নেতা পিয়েট্রো ফলেনা সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, বুশ প্রশাসনকে খুশি করার জন্য বালুস্কোনি সরকার ঝুঁকির কথা বিবেচনা না করেই ইরাকে সেনা পাঠায়। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে অবিলম্বে ইরাক থেকে ইটালীর

সকল সৈন্য প্রত্যাহার করে আনা। ইটালীর অন্য বিরোধী দলগুলো নেতারাও ফলেনার সাথে একমত পোষণ করে সেনা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

খ্রিষ্টান বিশ্বের প্রধান পুরোহিত পোপ দ্বিতীয় জন পল নাসিরিয়ার আত্মঘাতী বোমা হামলার নিন্দা করে বলেছেন, এটা একটা কাপুরুষোচিত কাজ।

বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায়, তুরস্কের মত মিশরও ইরাকে সৈন্য পাঠাবে না বলে যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছে। মিসরীয় প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক গত মঙ্গলবার বলেন, জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই ইরাকে সৈন্য না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওয়াশিংটনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে কোন আরব দেশই ইরাকে সৈন্য পাঠাচ্ছে না। কারণ সেখানে সৈন্য পাঠানোর অর্থ দাঁড়াবে ইরাকে অবৈধ মার্কিন দখলদারিত্বকে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয়া।

ইরাক যুদ্ধের ঘোর বিরোধী দেশ জার্মানী বাগদাদে ৩জন সৈন্য পাঠিয়েছে। এই ৩সৈন্য বাগদাদস্থ জার্মান দুতাবাস প্রহরা দেবে এবং যেসব জার্মান নাগরিক নিরাপদে ইরাক ত্যাগ করতে চায় তারেদ সাহায্য করবে এরা কখনই কোন সংঘর্ষে জড়াবে না।

মুজাহিদ নেতা ওসামা বিন লাদেনের

নতুন আহ্বান

কায়রো, মিশরঃ সম্প্রতি আল-জাজিরা টেলিভিশনে এক অডিও টেপের মাধ্যমে ওসামা বিন লাদেন বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে এবং বাইরে প্রচণ্ড আঘাত হানার। তিনি অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, ফেদায়ী হামলা অব্যাহত থাকবে যুক্তরাষ্ট্র এবং মদদদাতা সেই সমস্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক দখলে সাহায্য করেছে। তিনি আরব বিশ্বের সকল মুজাহিদ ভাইদের ইরাকে এসে এই জিহাদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি সেই ইরাকীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন যারা যুক্তরাষ্ট্র ওতার মিত্রবাহিনীর সাথে সহযোগিতায় রত। তিনি বলেন, অন্যান্য যুদ্ধের শরিক সকল শক্তি, বিশেষ করে বৃটেন, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, পোল্যান্ড, জাপান এবং ইটালীর বিরুদ্ধে যথা সময়ে ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আমাদের আছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত

ঘোষণার কিছু দিনের মধ্যেই ইরাকের নাসিরীয়া শহরে ইটালী অবস্থানের উপর হামলা চালানো হয় এবং এতে প্রায় ২৩ জন ইটালীয় সৈনিক নিহত হয়।

তিনি ইরাকী মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আল্লাহর সৈনিক এবং ইসলামের তীর। মুসলিম মিল্লাত আজ যে জিহাদে অবতীর্ণ তার ফ্রন্ট লাইনে আপনাদের অবস্থান। আল্লাহর রাস্তায় পরাজিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কাজেই জিহাদ চালিয়ে যান।

তিনি মার্কিন জনগণের উদ্দেশ্যে করে বলেন, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব এবং আমাদের ফেদায়ী (আত্মোৎসর্গকারী) হামলা অব্যাহত থাকবে আমেরিকার ভিতরে ও বাইরে। যতক্ষণ পর্যন্ত মার্কিন নির্বুদ্ধিতা ও অন্যায় অবস্থানের অবসান না ঘটে।

তিনি মার্কিন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের রক্তে আমেরিকান শক্তিমত্তার কূপিতে সলতা সংযোজন হবে মাত্র। আর পরিপুষ্ট হবে হোয়াইট হাউসের অস্ত্র কমিশন এজেন্টরা।

তিনি বলেন, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের কাদা ভূমিতে মার্কিনীদের কবর রচিত হবে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর ইচ্ছায় মার্কিনীদের আত্ননাদ সর্বশীর্ষে পৌঁছাবে শ্রীম্মই এবং শ্বাস যন্ত্রে জমা হবে শুধুই দীর্ঘশ্বাস।

ওসামা বিন লাদেন বলেন, বুশ মনে করেছিল ইরাকের তেল বুঝি সহজ সম্পদ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ইরাকের তেলের মূল্য মার্কিনীদের রক্তের মূল্যের চেয়েও বেশি। অনেক বেশি।

পরিশেষে, সকল মুসলিম ভাইদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান, এই শহীদি কাফেলায় যুক্ত হবার এবং আমেরিকার স্বপ্ন সৌধ চুরমার করার জন্য।

সৌদি সরকারের কাণ্ড

আল মাগাযী ডেস্ক : আমেরিকানদের জীবনে কালো অধ্যায় বলে সূচিত ১১ই সেপ্টেম্বরের পর সৌদি সরকার তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র আমেরিকান জনগণের মন জয় এবং বুশ প্রশাসনের নেক নজর লাভের আশায় ১৭.৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। উক্ত অর্থ বিভিন্ন আমেরিকান লবিং ফার্ম মিডিয়া কোম্পানীগুলোকে দেয়া হয়েছে। সৌদি সরকারের প্রশংসামূলক বক্তব্য উপস্থাপন ও বুশ প্রশাসনের কষ্ট খানিকটা লাঘব করার কাজে।

উল্লেখ্য, জর্জ ডব্লিউ বুশের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠবলে পরিচিত টমাস লোয়েফলার এবং তার লবিং ফার্মকে সৌদি সরকার প্রথমেই প্রদান করেন ৪,২০,০০০ ডলার। কারণ মি. লোয়েফলার, বুশ যখন টেক্সাস রাজ্যের গভর্নর ছিলেন তখন সবচেয়ে বড় ডোনার হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণা করতে সাহায্য করেছেন। এদিকে রিচার্ড শিবলী এবং আর, আলা ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর সৌদি আরবের বড় সমালোচক হয়ে ওঠেন। সৌদি সরকার তাদের কজা করতেও ব্যয় করেন ডলার ও অস্ত্র।

অনুরূপভাবে ওয়াশিংটনের প্রখ্যাত লবিং ফার্ম “প্যাটন বাগস” এবং “ডাটন এ্যান্ড ডাটন” কোম্পানীকে সৌদি সরকার আমেরিকার সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যয় করে যথাক্রমে ৪,৫৬,০০০ ডলার ও ৬,২৫,০০০ ডলার।

পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, সৌদি সরকার তাদের প্রিয় মিত্র আমেরিকানদের এতটুকু মন খারাপ দেখতেও নারাজ। বিনিময়ে যত পেট্রো ডলার-ই ব্যয় হোক না কেন। সমালোচকদের মতে, এ যেন এক স্বীয় অস্তিত্বহীন সৌদি সরকার। আমেরিকানরাই সব কিছু।

ইরাকে দৈনিক গড়ে ৪০টির বেশি

গেরিলা হামলা

নিউইয়র্ক থেকে এনা : গত কয়েক সপ্তাহে দৈনিক গড়ে ৪০টিরও অধিক হামলা হয়েছে ইরাকে মার্কিন বাহিনীর উপর। ইরাকে কর্মরত আমেরিকান সামরিক অধিকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক টাইমস এ খবর প্রকাশ করেছে। গেরিলা হামলার উৎস এবং কোথা থেকে তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কিংবা এই হামলার অংশ নিচ্ছে কারা ইত্যাদি তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য ১৪০০ সদস্যবিশিষ্ট একটি টিম প্রেরণ করা হয়েছিল গ্রামে-গঞ্জে। কিন্তু সেই টিম তেমন কোন তথ্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি। শুধু তাই নয়, বায়োলজিক্যাল এবং কেমিক্যাল অস্ত্র সন্ধানের চাইতে এখন গেরিলাদের ঘাঁটি সন্ধানকেই মার্কিন কমান্ডাররা অধিক জরুরী বলে মনে করছেন। পেন্টাগনের ধারণা, সর্বোচ্চ ৫০০০ ইরাকী গেরিলা হামলায় অংশ নিচ্ছে।

(বাকী সংবাদ ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাম্রাজ্যবাদীদের কালো থাবা

নাস্তিক্যবাদ-ধর্মাস্তকরণ
-এনজিও প্রসঙ্গ
শাহাদাত হোসাইন

(পূর্ব প্রকাশের পর)

প্রিয় পাঠক,

আমি আমার প্রবন্ধ “নাস্তিক্যবাদ-ধর্মাস্তকরণ-এনজিও প্রসঙ্গের প্রথম পর্বে নাস্তিক্যবাদের সাথে এনজিও কানেকশন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আমি এ পর্বে ধর্মাস্তকরণের সাথে এনজিওদের সম্পর্কের দিক আলোকপাত করব। সেই সাথে সারা দেশব্যাপী যে ব্যাপক হারে ধর্মাস্তকরণ চলছে তার একটি সামগ্রিক চিত্র আমি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখপূর্বক চিত্রায়িত করব ইনশাআল্লাহ।

খৃষ্টান মিশনারী এনজিওগুলো সাংস্কৃতিক টনিক, মহাশিক্ষা, সালসা, অর্থনীতি সিরাপ আর দারিদ্র বিমোচন ট্যাবলেটের লোভ দেখিয়ে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও অবশেষে দেশ দখলের পায়তারা করছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এরা এজেন্ট এ বিষয়টি আজ সুস্পষ্ট হয়েছে। খৃষ্টান মিশনারী এনজিওদের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত আজ প্রকাশিত হয়ে গেছে।

খৃষ্টান মিশনারী এনজিওরা একটি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অগ্র বাহিনী হিসাবে দেশে-দেশে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের দরদ যেন তাদের উথলে পড়ছে। বিশ্ব মানবতার জন্য তাদের এতো মায়াকান্নার পেছনে রহস্য আজ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ঐ সমস্ত দেশ তাদের প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দু যাদের মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় অত্যন্ত কম, পরনির্ভরশীল অর্থনীতি এবং উপনিবেশবাদের বন্দীশালা থেকে মুক্তির পথ সুষ্ঠু রাজনৈতিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা সহ ধর্মীয় অনৈক্য, ক্ষুধা ও দারিদ্রের সুযোগে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মীয় সাম্যবাদের মাঝে খৃষ্টানধর্ম ক্রমশই স্থান করে নিচ্ছে।

ভারতে নির্যাতিত সংখ্যালঘু হরিজনদের মাঝেও খৃষ্টান মিশনারীরা সফলতার ছোয়া পেয়েছে। ফলে তারা এ অঞ্চলকেও উর্বর স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ফিলিপাইন ও সাহারার পার্শ্ববর্তী আফ্রিকার মুসলিম দেশ গুলোকেই খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে খৃষ্টানধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে শুধুমাত্র ১৯৮৫ সালের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থই তাদের ব্যাপক তৎপরতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয় যে, ব্যয়ের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ানো হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে এ কাজে তিন লক্ষ একাশি হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বিশ্ব খৃষ্টান এনসাইক্লোপেডিয়ার সম্পাদক এ্যাংলিকান পরিসংখ্যানবিদ ডেভিড ওয়ারেন সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে মুসলিম দেশসমূহে ক্রমবর্ধমান খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পরিপেক্ষিতে এ ব্যয়কে প্রতি বছরই বাড়ানো হবে বলে জানান। ‘ট্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনাল’ (কানাডা) নামক আন্তর্জাতিক খৃষ্টান প্রচার সংস্থার সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, উল্লেখিত এলাকাসমূহে স্থানীয় মিশনারীদের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের দু’লাখ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মিশনারী কাজ করছে।

এসব রাষ্ট্রে এক হাজার পাঁচশ আশিটি রেডিও, টিভি কেন্দ্র হতে সম্পূর্ণরূপে খৃষ্ট ধর্মের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং একুশ হাজার সাময়িকী প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ খৃষ্টান মিশনারী সংস্থাগুলো এখন NGO নামের ছদ্মবেশ বা পোষাক ধারণ করেছে। এদেশে এক সহস্রাধিক খৃষ্টান মিশনারী এনজিও সংস্থা দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে কোথাও স্কুলের নামে এদেশের কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের কলিজায় খৃষ্টধর্মের ছাপ বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। কোথাও দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার নামে হাসপাতালে মৃত্যু পথযাত্রী মানুষকে ধর্মাস্তরিত করা হচ্ছে।

পার্বত্য এলাকাসমূহে উপজাতীদের প্রলোভন দেখিয়ে পূর্ব পুরুষদের ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে দরিদ্র কৃষক কুলের মাঝে চারা, বীজ, সার, নলকূপ বিতরণ ও উন্নত চাষাবাদের প্রক্রিয়া শিক্ষা

দেয়ার নাম করেও তারা এ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তাদের সাহায্য সহানুভূতির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে খৃস্টধর্মের অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে পলাশী স্টাইলে বাংলাদেশ দখল। উল্লেখ্য বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৭০ লাখের মতো লোককে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ধর্মান্তরিতদের মধ্যে মুসলমান ছাড়াও রয়েছে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং উপজাতীয় লোকেরা। (১৯৮৫ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় এক কোটি লোক মিশনারী খৃস্টানদের দ্বারা ধর্মান্তরিত হয়েছে মর্মে চাঞ্চল্যকর তথ্য ছাপানো হয়।) তাদের সে রিপোর্ট যদি সত্যি হয় তাহলে গত ১৮ বছর (১৯৮৫-২০০৩) এদেশে খৃস্টানদের সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। কোনকোন ক্ষেত্রে খৃস্টান মিশনারী এনজিওরা সরকারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সাহায্যদাতা দেশগুলো এবং বিশ্বব্যাংকের ভয়ে সরকার এদের গায়ে হাত দেয় না। এদের চরম ধর্মদ্রোহী তৎপরতার পরও এদের কিছু বলেনা। সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এনজিওরা এদেশের মুসলমানদের ঈমান ও আকীদার উপর ক্রমাগত আঘাত হেনে যাচ্ছে। ধর্মান্তরিত করে যাচ্ছে প্রকাশ্যেই এ দেশের কৃষক, শ্রমিক তথা গরীব শ্রেণীকে ছলে বলে কৌশলে। এদেশের মুসলমানদের ঈমান আকীদাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য সুচতুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যেমন তাদের নানামুখী কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে প্রথমেই টাকা দিয়ে ক্রয় করে নিয়েছিল কিছু সংখ্যক মীর জাফর, ঘষেটি বেগম, উমি চাঁদ, জগৎ শেঠ এবং তাদের সহযোগিতায় তৎকালীন সময়ে কোম্পানী এদেশীয়দের জাতি, ধর্ম তথা স্বাধীনতাকে হরণ করেছিল। তেমনিভাবে বর্তমানেও এনজিওরা সাম্রাজ্যবাদের অগ্রবাহিনী হিসাবে বামপন্থী কিছু সংখ্যক তথাকথিত স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় নেমেছে দেশ ও জাতির স্বাধীনতা, দীন ও ঈমানের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্ত করতে।

আমরা এদেশের ইসলামপন্থী ও সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রতিবেশী ভারতের দিকে নজর দিতে অনুরোধ করছি। ভারতের নতুন অঞ্চলেও খৃস্টান মিশনারী সংগঠনের বিশেষ লোকদের

তৎপরতার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। উচিত বৃহৎ শক্তি হয়েও ভারত সরকার এ ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। খৃস্টান মিশনারীদের নগ্ন চেহারা উন্মোচিত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে খৃস্টান মিশনারীদের তৎপরতা সরকারীভাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। খৃস্টান মিশনারীদের (এনজিওদের) আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মুখোশ খুলে পড়ার পর আমাদের দেশের মুসলমানদের ভাবা উচিত—

- ১) মিশনারী খৃস্টান এনজিওদের সেবা তৎপরতায় সত্যিই কি আমরা লাভবান হচ্ছি?
- ২) এনজিওরা এক পয়সার সাহায্য দিতে ১৪ পয়সার শর্ত লাগায় কেন?
- ৩) এনজিওরা কোটি কোটি টাকা এদেশে বিনিয়োগ করছে কেন?
- ৪) সময়ের প্রয়োজন ও সুযোগ বুঝে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ও ঘূর্ণি দুর্গত এলাকায় যেসব মিশনারী খৃস্টান এনজিওরা এসেছিল তারা আর চলে যাচ্ছে না কেন? তারা কেন স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে?

এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে একটা সিদ্ধান্তে আমাদেরকে পৌছতে হবে। সেটা হচ্ছে, “সমৃদ্ধির চেয়ে আমাদের ঈমান এবং আকীদা বড়। ডলার আর রুবল এর বিনিময়ে আমাদের ঈমান ও আকীদা ক্রয়ের চক্রান্তকে পদাঘাত করি।”

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খৃস্টান মিশনারীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণের ফলে আমাদের দেশে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু খৃস্টান মিশনারীদের বা তাদের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত তথাকথিত এনজিওদের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করা, তাই তাদের দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রামবাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্য নিয়োজিত নয়। দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা অজস্র এনজিও এবং তাদের সহযোগী সংস্থাসমূহের মূল লক্ষ্য বাংলার নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক ভাগ্যের উন্নয়ন নয়। বরং একটি গোপন লক্ষ্যকে (ধর্মান্তকরণ) বাস্তব

বায়িত করার জন্য একটা শ্লোগান এবং অপকৌশল হিসাবে ব্যবহার করছে।

বাংলাদেশে খৃস্টান জগতের খয়রাতি অর্থের প্রচুর ছড়াছড়ি। দেশী, বিদেশী প্রেসে লাগামহীন মহিলা কীর্তন এবং দাতা দেশসমূহ এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সীমাহীন গুরুত্ব আরোপের ফলে আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক লোকের মনে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের দেশের গরীব জনসাধারণের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্যই এনজিওরা আমাদের দেশে এসেছে। তাই বাস্তবধর্মী পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল সত্য উদ্ঘাটিত করা একান্ত আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

স্যালভেশন আর্মি

‘দ্যা স্যালভেশন আর্মি’ একটি এনজিও। প্রধান কার্যালয় এর লন্ডনে। ১৯৭৭ সাল থেকে এদেশে এর কার্যক্রম চলে আসছে। এর কার্য এলাকা ঢাকার মিরপুর, যশোর এবং খুলনা জেলার কিছু এলাকা। এর বিরুদ্ধে ধর্মাস্তকরণের নানা অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে সংস্থা পরিচালিত শিশুদের বিদ্যালয়ে। বাধ্যতামূলকভাবে খৃস্টধর্ম পড়ানো হয় এবং প্রতি রোববার দিন প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে গির্জায় যেতে বাধ্য করা হয়। এদের কার্যক্রম সম্পর্কিত মেনিফেস্টোর ১৭ তম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে লেখা আছে— “খৃস্টধর্ম ইসলাম ধর্মের চাইতে মহত্তর। সুতরাং আমরা বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে খৃস্টধর্মের মহত্ত্ব তুলে ধরে তাদেরকে খৃস্টান বানানোর প্রচেষ্টায় সদা লিপ্ত থাকব। আমাদের লক্ষ্য থাকবে প্রতি বছর আমরা যেন ১ লক্ষ লোককে সত্যধর্মের (খৃস্টধর্মের) আওতাভুক্ত করতে পারি। প্রভু যীশু আমাদের সহায় হোন— (আমীন)। সচেতন মহলের বোধগম্য নয়— স্যালভেশন আর্মি বা এ জাতীয় খৃস্টান এনজিওদেরকে আমাদের দেশের জনগণ এবং শিশু জনশক্তির মগজ ধোলাই করার এবং শিশুদেরকে খৃস্টান স্টাইলে গঠন করার অধিকার আর কতদিন ভোগ করতে দেয়া হবে? এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে একদিকে যেমন আমাদের দেশপ্রেমিক ও ধর্মপরায়ণ নাগরিকরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, অন্যদিকে খৃস্টান

এনজিওরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে খৃস্টান ধর্মের মূলনীতি শিক্ষা প্রদানে দারুণভাবে উৎসাহিত হচ্ছে।

ভারতের চানক্য নীতি

(৩৭ নং পৃষ্ঠার পর)

নিশ্চিত কেউ ছিলনা যে ভারত কবে নাগাদ স্বাধীন হবে হলেও কখন হবে? কিন্তু একথা আজ ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে যে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেহেরু সেদিন ‘Nuclear India’ র স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং ভারতে পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের ২৬শে জুন এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন “যতদিন পৃথিবী এখানকার মত পরিচালিত হবে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিটি দেশের একটি যথার্থ উপকরণ থাকবে এবং সে তার নিরাপত্তার খাতিরে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। আমার এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারত তার নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নয়ন সাধন করবে এবং আমি আশা করি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক শক্তিকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করবেন। কিন্তু ভারত যদি আক্রান্ত হয়, তবে যে অতি অবশ্যই তার ভাগ্যে যা কিছু মজুদ আছে, তা নিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করার। আমি আশা রাখি যে, সাধারণত ভারত অন্যান্য দেশের সাথে মিলিতভাবে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারে বিরোধিতা করবে।”

নেহেরুর এই বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি কথার মারপ্যাঁচে ভারতের পারমাণবিক বোমা অর্জনের কথা বিশ্বকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন। এর পরে ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। এখন পৃথিবীর সবাই জানে ভারত এ্যাটম বোমা তৈরীর পরবর্তী স্তরে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে যাচ্ছে। পাঠক, এবার দেখা যাক, ভারত কিভাবে প্রাচীন ভারতীয় কূটনৈতিক চানক্যের ছয়টি সূত্র অনুস্মরণ করে আসছে। প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে অন্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। আজকের আধুনিক পারমাণবিক শক্তির অধিকারী অহিংস ভারত তার সীমান্ত ও পার্শ্ববর্তী প্রতিটি রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করেছে। (চলবে.....)

পাহাড়ে যুদ্ধ

(১৫ নং পৃষ্ঠার পর)

প্রশিক্ষণের পর ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তার জীবনের প্রথম যুদ্ধের কথা জাহিদ এর স্মৃতিপটে আজও ভেসে ওঠে। কাশ্মীর থেকে সীমান্তে যাওয়ার প্রধান সড়কের এক স্থানে রাস্তা গিয়েছে বনভূমির পাশ দিয়ে। এই এলাকায় বিচ্ছিন্ন গাড়ি সৈন্যদলের উপর প্রায়ই মুজাহিদরা হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে আক্রমণ করে ভারতীয় সৈন্য হাতহত করতো এবং রসদ ও অস্ত্র সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাতো। এজন্য এক সময় ভারতীয়রা সেই স্থান পাহারা দিতে একটি সেনা ছাউনি স্থাপন করে। ফলে কৌশলগত কারণে মুজাহিদরা কিছুদিনের জন্য আক্রমণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। তারপর সিদ্ধান্ত হয় ভারতীয় ছাউনিটি ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হবে। জাহিদ এর সাথে লতিফ, সোহেল, আলতাফ, বশির ও নাসের- কে ঐ আক্রমণের জন্য বাছাই করা হয়। তাদের লিডার নির্বাচিত করা হয় জুলফিকার- কে।

নির্দিষ্ট দিন রাত ১১টার দিকে তারা সেনা ছাউনিটির আশেপাশে প্রায় বার/তের গজ জায়গা পরিষ্কার করা ছিল রাতে লাইট জ্বালিয়ে চারিদিকে আলোকিত করা ছিল। ফলে ছাউনির খোলা অংশ দিয়ে ভেতরে মদ ও নর্তকীদের নিয়ে স্কুতিরত গুয়ারের মত চেহারার শিখ সৈন্যদের দেখা যাচ্ছিল। পরিকল্পনা মত ঠিক রাত একটায় তাবুর পিছন দিকে ঝোপে শব্দ ও নড়াচড়ার আওয়াজ ওঠে। বনের শেয়ালগুলি সৈন্যদের উচ্ছিষ্ট গোশত ও হাড়ের লোভে প্রায়ই হানা দিত বলে ছাউনীর দুই পাহারাদার ব্যাপারটিকে খুব বেশী পাত্তা দিল না। তবে তারা সতর্ক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। আসলে তাদের মন পড়েছিল ছাউনীর ভেতর।

তাই তাদের চোখ ঝোপের দিকে থাকলেও তারা তেমন কিছু দেখছিল না। ঝোপের নড়াচড়া ছিল জুলফিকার ভাইয়ের কারসাজি। প্রথমে তিনি ঝোপের ভিতর কয়েকটি টিল মারেন। এরপর কিছুডালে আগে থেকে বেধে রাখা কালো সুতো ধরে নিয়মিত বিরতিতে টান দিতে থাকেন। ঘটনাটি তাবুর পিছন দিকে ঘটায় সৈন্যদ্বয় তাবুর আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। অনেক ধরে ঝোপে নড়াচড়া চলতে থাকায় একেবারে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় সৈন্য দুইজন ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতে থাকে। তারা ঝোপের দিকে নজর রেখে গাধার মত কোন গুলি না করে বা চিৎকার করে সঙ্গীদের হুঁশিয়ার না করে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসছিল। (চলবে)

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)

(৩৪ নং পৃষ্ঠার পর)

তিনি রাসূলের (সা) নিকট তলোয়ারখানি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জবাবে তিনি বললেন : এ তলোয়ার না তোমার না আমার। সা'দ রাসূলের (সা) নিকট থেকে উঠে কিছুদূর যেতে না যেতেই সূরা আনফাল নাযিল হয়। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে ডেকে বলেন : তোমার তলোয়ার নিয়ে যাও।

উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের এক বছর পর। হযরত সা'দ এ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কতিপয় মুসলিম সৈনিকের ভুলের কারণে নিশ্চিত বিজয় যখন পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন মুষ্টিমেয় যে ক'জন সৈনিক নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূল (সা) কে ঘিরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন, সা'দ (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইমাম বুখারী এ ঘটনা সা'দের (রা) যবানেই বর্ণনা করেছেন : 'উহুদের দিনে রাসূল (সা) তাঁর তুনির আমার সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন : তীর মার ! আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক।' ইবনে সা'দ আরও বলেছেন : 'ঘটনাক্রমে একটি তুনির ফলা ছিলনা। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এটাতো খালি। বললেন : ওটাও ছুঁড়ে দাও।'।

হযরত সাদের এক ভাই 'উমাইর বদর যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধে সা'দ (রা) যখন কাফিরদের প্রবল আক্রমণ থেকে রাসূল (সা) কে হিফাজতের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে লড়ছেন, ঠিক তখনই তাঁর অন্য ভাই নরাদম 'উতবার নিষ্কিণ্ড প্রস্তরাঘাতে প্রিয় নবীর মুখ আহত হয় এবং একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। সা'দ (রা) প্রায়ই বলতেন : কাফিরদের অন্য কাউকে হত্যার এত প্রবল আকাংখা আমার ছিল না যেমন ছিল 'উতবার ব্যাপারে। কিন্তু যখন আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনলাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের চেহারা রক্ত-রঞ্জিত করেছে, তার ওপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে, তখন তার হত্যার আকাংখা আমার নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং আমার অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে। উহুদের যুদ্ধে তিনি এক অস্বাভাবিক দৃশ্য অবলোকন করেন। তিনি বলেন : 'উহুদের দিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) ডানে ও বামে ধবধবে সাদা দু'ব্যক্তি দেখতে পেলাম, কাফিরদের সাথে প্রচণ্ড লড়ছে। এর আগে বা পরে আর কখনও আমি তাদেরকে দেখিনি।' চলবে.....।

নাম আবু ইসহাক সাদ, পিতা আবু ওয়াক্কাস মালিক। ইতিহাসে তিনি সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস নামে খ্যাত। কুরাইশ বংশের বনু যুহরা শাখার সন্তান। মাতার নাম 'হামনা'। পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন কুরাইশ বংশের। সাদদের পিতা আবু ওয়াক্কাস ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁর অন্তিম রোগশয্যায় রাসূল (সাঃ) তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। মাতা হামনাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে প্রথমতঃ তাঁর পুত্র সাদদের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে হৈ চৈ ও বিলাপ শুরু করে লোকজন জড়ো করে ফেললেন। মায়ের কাঁদ দেখে ক্ষোভে দুঃখে হতভম্ব হয়ে সাদ ঘরের এক কোণে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ বিলাপ ও হৈ চৈ করার পর মা পরিষ্কার বলে দিলেন : সাদ যতক্ষণ মুহাম্মাদের রিসালাতের অস্বীকৃতির ঘোষণা না দেবে ততক্ষণ আমি কিছু খাব না, কিছু পান করব না, রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য ছায়াতেও আসব না। মার আনুগত্যের হুকুম তো আল্লাহও দিয়েছেন। আমার কথা না শুনলে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে এবং মার সাথে তার কোন সম্পর্কও থাকবে না।

সাদ (রাঃ) বড় অস্থির হয়ে পড়লেন। রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে সব ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলের (সাঃ) নিকট থেকে জবাব পাওয়ার পূর্বেই সুরা আল আনকাবুতের অষ্টম আয়াতটি নাযিল হল :

আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বলে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের মেনো না।

কুরআনের এ আয়াতটি সাদদের (রাঃ) মানসিক অস্থিরতা দূর করে দিল। তাঁর মা তিনদিন পর্যন্ত কিছু মুখে দিলেন না, কারো সাথে কথা বললেন না এবং রৌদ্র থেকে ছায়াতেও এলেন না। তাঁর অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে পড়ল। বার বার তিনি মার কাছে এসে

তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁর একই কথা, তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে। অবশেষে তিনি মার মুখের ওপর বলে দিতে বাধ্য হলেন : 'মা, আপনার মতো হাজারটি মাও যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার ব্যাপারে জিদ ধরে পানাহার ছেড়ে দেয় এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবুও সত্য দীন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' হযরত সাদদের এ চরম সত্য কথাটি তাঁর মার অন্তরে দাগ কাটে। অবশেষে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'আল-ফাযায়িল' অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাদদের (রাঃ) ভাই উমাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির কিছুদিন পরই ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ইবন খালদুন তার তারীখে উমাইরের পর আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু বকর ছিলেন সাদদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবু বকরের দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে আল মানাকিব অধ্যায়ে সাদদের সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাদ (রাঃ) বলেন : ইসলাম গ্রহণের পর আমি নিজেকে তৃতীয় মুসলমান হিসেবে দেখতে পেলাম। আসলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেকের মতই তখন তিনি ঘোষণা দেননি। আর একথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর মার ঘটনা এবং সুরা আনকাবুতের আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর। কারণ এ আয়াতটি নবুয়তের চতুর্থ বছর নাযিল হয়। সম্ভবতঃ এ সময়ই তিনি ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি মায়ের নিকট প্রকাশ করেন।

নবুয়তের তৃতীয় বছরে সুলাইম গোত্রের আমার ইবন আব্বাস গোপনে রাসূলুল্লাহর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনও প্রকাশ্য দাওয়াতের অনুমতি আল্লাহর তরফ থেকে আসেনি। ইসলাম গ্রহণের পর আমার শিয়াবে আবু তালিবের এক কোণে নামায আদায় করছিলেন। কুরাইশরা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তা দেখে দু'একজন মুসলমানের সাথে সাদও এগিয়ে এলেন এবং উক্ত কুরাইশ কাফিরদের সাথে তাদের ঝগড়া ও হাতাহাতি শুরু হয়। সাদ তার

চাবুক দিয়ে এক কাফিরকে বেদম মার দিলেন। লোকটির দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। কোন মুসলিমের হাতে কোন মুশরিকের রক্ত ঝরানোর এ ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম।

হযরত মুসাইব বিন উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতুমের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর যে চার ব্যক্তি মদীনায় হিজরত করেন তাদের একজন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। সহীহ বুখারীতে বারা' ইবনে আযির থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : সর্ব প্রথম আমাদের নিকট আগমন করেন মুসআব ইবনে উমাইর ও ইবনু উম্মি মাকতুম। এ ব্যক্তি মদীনাবাসীদের কুরান শিক্ষা দিতেন। অতঃপর বেলাল, সা'দ ও আন্নার বিন ইয়াসির আগমন করেন। ইবন সাদ তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে ওয়াকিদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সাদ ও তার ভাই উমাইর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসে তাদের অন্য এক ভাই উতবা ইবন আবী ওয়াক্কাসের নিকট অবস্থান করেন। তার কয়েক বছর পূর্বেই উতবা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় নেয়।

আল্লাহর পথে জিহাদে হযরত সাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার বীরত্ব ও সাহসিকতা ইসলাম-দুশমনদের খুব মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন। তিনি নিজেও বলতেন আমি প্রথম আরব যে আল্লাহর জন্য তীর চালনা করেছিলাম।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর বেশ কিছুকাল যাবত মুহাজির মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাদের না ছিল খাদ্য সম্ভার, না ছিল পরিধেয় বস্ত্র এবং না ছিল সুনির্দিষ্ট জীবিকার উপায়। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের চাপে মদীনায় সীমিত পরিসরে অর্থনৈতিক ভিতটি নড়ে উঠেছিল। মদিনার আনসার মুহাজির নির্বিশেষে গোটা মুসলিম সমাজ চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে নিপতিত হয়। এমন চরম দারিদ্রের মধ্যে তারা ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ জারি রাখেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাদের এ চরম দারিদ্র্য

সম্পর্কে হযরত সা'দ বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম; অথচ তখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার কিছুই ছিল না। (তা খেয়েই আমরা জীবন ধারণ করতাম) আর আমাদের বিষ্ঠা হত গরু ছাগলের বিষ্ঠার মত।' (বুখারী ও মুসলিম : মানাকিবু সা'দ রা.)

হিজরাতের এক বছর পর সফর মাসে রাসূল (সাঃ) ষাটজন উষ্ট্রারোহীর একটি দলকে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে টহল দিতে পাঠলেন। এ দলে সা'দ ছিলেন। এক পর্যায়ে ইকরামা ইবন আবী জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশদের বিরাট একটি দল তাঁরা দেখতে পেলেন। কিন্তু উভয় পক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল। তবে কুরাইশ পক্ষের কেউ একজন হঠাৎ জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলে হযরত সা'দ সাথে সাথে তীর নিক্ষেপ করলেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে কাফিরদের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর।

হিজরী দ্বিতীয় সনের রবিউল সানী মাসে রাসূল (সা) দু'শ সাহাবীকে সংগে নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। উদ্দেশ্য, মদীনার আশে পাশে দুশমনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং দুশমনদের জানিয়ে দেওয়া যে মুসলমানরা ঘুমিয়ে নেই। এ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন হযরত সা'দ (রা)। বাওয়াত নামক স্থানে কুরাইশদের সাথে এবার ছোট খাট একটি সংঘর্ষও হয়। এর ছয়মাস পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বদর যুদ্ধের অল্প কয়েকদিন আগে রাসূল (সা) কুরাইশ কাফিলার সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিন জনের যে দলটি পাঠান তাদের একজন ছিলেন সা'দ (রা)। তাঁরা বদরের কূপের নিকট ওৎ পেতে থেকে প্রতিপক্ষের দু'জনকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে আসেন। রাসূল (সা) তাঁদের নিকট থেকে শত্রু পক্ষের অনেক তথ্য অবগত হন।

বদরে সা'দ ও তাঁর ভাই 'উমাইর (রা) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়েন। প্রত্যেকেই একাধিক কাফিরকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠান। এ যুদ্ধে হযরত 'উমাইর (রা) শাহাদাত বরণ করেন। এবং সা'দ (রা) সাঈদ ইবদ আ'সকে হত্যা করে তার তলোয়ার খানি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট সমর্পণ করেন।

(৩৩ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

মাসিক আল মাগাযী

গালিব সরকার

মা - সিক আল মাগাযী,
এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপহার।
সি - হের মতো উঠেছে গর্জে,
ভয় ভীতি নাই যার
ক - বর দিবে সাম্রাজ্যবাদীর,
গড়বে নতুন বিশ্ব।
আ-ল কায়েদার শ্রেষ্ঠ নেতার,
বানিয়ে দেবে শিষ্য।
ল - জিত আমি মুসলিম জাতি,
জিহাদী চেতনা হারিয়ে,
মা- র ধোর খেয়ে দিশেহারা হয়ে,
আছি নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে।
গা - ইতে শেখাবে তুমি মুক্তির গান,
লড়তে শেখাবে আজি।
যী - যাদাহ হবে জ্ঞান ও ঈমান
পড়লে মাসিক আল মাগাযী

জেলখানার ভাইদের প্রতি-

মাহদী হাসান

মুজাহিদ তুমি আর কতকাল
এমনি করে থাকবে বসে।
ঝাঁপিয়ে পড় ঐ
কাফির তাগুতের উপর
ঈমানী জোশে।
জেলের তালা ভেঙ্গে দিয়ে
বেরিয়ে আস ময়দানে।
দুনিয়াতে তোমায় ঠেকিয়ে রাখবে
এমন শক্তি কোনখানে।
তোমাদের আছে ঈমানী শক্তি
তাদের তা নেই।
তোমরাই তো বীর মুজাহিদ
সিপাহসালার তোমরাই।

আহ্বান

হায়দার আলী

আল্লাহ যদি করেন দয়া মোদের তরে ফের,
টুটবে তাগুত খতম হবে জালিম শাহীদের।
বীরের জাতি পিছে কেন উঠনা জেগে ফের
মুক্ত কর আকসা বাবরী মাজলুম মা বোনের
পরিচয় তোরা বীরের জাতি খালিদ, তারিক, মুসা
কাপুরুষের চাঁদর গায়ে আছিস কেন বসা।
পরনা মাথায় বীর খালিদের রক্ত মাথা তাজ!
শহিদী মওত মোদের চাওয়া আল্লাহ আলার পাক রাহে
গণতন্ত্রের ষড়যন্ত্র প্রতারণার ফাঁদ
ছেড়ে দে সব ভ্রান্ত নীতি শক্ত কর কাঁধ
এক হাতে ইসলামের দাওয়া আরেক হাতে তলোয়ার
চলবো না আর তাগুত মতে দিয়েছেন আল্লাহ এখতিয়ার
তাগুতের বিষ দাঁত ফেলবো ভেঙ্গবো বর্বরতার করবো শেষ
তাইতো এবার হচ্ছে প্রস্তুত জে এম বাংলাদেশ।

বড্ড প্রয়োজন আজ . . .

সুমাইয়া আক্তার সুমা

তুমি জানতে চেয়েছ কেমন আছি আমি,
আর কেমনই বা আছে এই বিশ্বের নোংরা
সমাজের
অসুস্থ মানুষেরা?
এখানকার প্রতিটি মুহূর্তেই তুমি কান পাতলেই
শুনবে যুদ্ধক্ষেত্রের আহত ভাইয়ের কাতরানি,
আর ধর্মিতা বোনের আর্ত চিৎকার।
কিংবা কোন সন্তান হারা মায়ের
বুক ফাটা হাহাকার
জনপদের লোক গুলো কেমন ভীত সন্ত্রস্ত!
অথচ তাদের প্রতিটি চোখ
প্রতিশোধের আগুনে ভরা,
কিন্তু . . . কিছুই নেই করার।
এজন্য বড্ড প্রয়োজন আজ
একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের
যার দ্বারা উপকৃত হবে আমার, তোমার আর . . .
এই অসুস্থ বিশ্বের হাজারো মানুষেরা।

প্রাচীন ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-৩০০) মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক উপদেষ্টা চানক্য যিনি 'কৌটিল্য' নামেও পরিচিত, তিনি অর্থশাস্ত্র (Science of politics) নামে একটি বই লিখেছিলেন। ভারতীয় শাসক ও রাজনৈতিকবিদরা আজো তাদের কূটনীতি ও গুপ্তচরবৃত্তির ক্ষেত্রে চানক্যকে অনুসরণ করে থাকেন। গুপ্তচরবৃত্তিতে পারদর্শী এবং প্রতারক চানক্য রাজনীতি ও কূটনীতি সম্পর্কে ছয়টি তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তত্ত্বগুলো হলো :-

১. 'সাম' (সন্ধি ও বন্ধুত্ব) অর্থাৎ অন্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তির মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে।
২. 'দান' (অর্থ দান, সাহায্যদান) অর্থাৎ অন্যকে নিজের কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা চাইতে বাধ্য করাই হচ্ছে মিত্রতা।
৩. 'ভেদ' (শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রে বিভেদের সৃষ্টি করা) অর্থাৎ সকল সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রকে শত্রু মনে করতে হবে। এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রবাদে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করতে হবে।
৪. 'দন্ড' (আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বা শাস্তি প্রদান) অর্থাৎ অনবরত আঘাত করে শত্রুকে আহত করতে হবে। এবং তার নামই হচ্ছে যুদ্ধ।
৫. সামরিক তৎপরতা চালনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শক্তিশালী মাত্রই যুদ্ধ করবেন।
৬. ক্ষমতা অর্জনের লোভ এবং অন্য দেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা মন থেকে মুছে যেতে দেয়া যাবে না। চানক্যের মতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্থায়ী শান্তি অবাস্তব। কারণ শক্তিশালী মাত্রই যুদ্ধ করবেন। শুধুমাত্র শক্তিই যে কোন দু'টি দেশ বা দুই রাজার মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে পারে। যুদ্ধ,

যড়যন্ত্র ও প্রতারণা করার ক্ষমতাকেই চানক্য রাজ গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম গুণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকে শুরু করে আজ আধুনিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত প্রত্যেক ভারতীয় শাসক উপরোক্ত চানক্যের সূত্রগুলো সুনিপুণ ভাবে অনুসরণ করে এসেছেন। তবে এ ব্যাপারে বিশেষ করে ভারতীয় কংগ্রেসের জওহর লাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, নরসীমা রাও প্রমুখ নেতা নেত্রীদেরকে An Expert Headmanter হিসেবে বিবেচনা করে চলে।

নিঃসন্দেহে জওহর লাল নেহেরু একজন দেশপ্রেমিক ও প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার যোগ্যতা সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। 'The discovery of Jandia' এবং 'Glimpsco of world History' এ দু'টি বই পড়লেই নেহেরুর পাণ্ডিত্য ও তার জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু নিজের দেশকে শক্তিশালী ও উন্নত করার জন্য তিনি যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা করেছিলেন, তা ছিল স্পষ্টভাবেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের প্রতিকূলে। তার বিরোধী পক্ষ ছাড়াও তার রাজনৈতিক সহযোদ্ধা কংগ্রেসের সভাপতি ও স্বাধীন ভারতের আজীবন শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার বিখ্যাত বই 'India Wins Freedom' গ্রন্থেও নেহেরুর এরূপ মনোবৃত্তির কথা প্রকাশ করেছেন।

১৯৪৫ সাল, সবেমাত্র আজকের স্বঘোষিত বিশ্ব মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চীন, তো দূরের কথা, পরাশক্তি রাশিয়া পর্যন্ত এটম বোমা তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় কেউ কি কখনো কল্পনা করেছে ভারতের মত দরিদ্র ও পরাধীন দেশ পারমাণবিক বোমা তৈরী করবে। কারণ তখনও

(৩৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আল-জিহাদ

ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা ও ইসরাইল মার্কিন এদের টার্গেট প্রথমত মিশরের তাগুত সরকারকে উৎখাত করে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা ১৯৮১ সালে নামধারী মুসলিম তাগুত সরকার আনোয়ার সাদাত কে হত্যা করে। '৯৩ সালে প্রধানমন্ত্রী আতেক সিদ্দী, মন্ত্রী হাসান আল-আলফীকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়।

'৯৫ সালের পর থেকে আল-জিহাদ মিশরে হামলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাবে তাদের তৎপরতা শুরু করে। '৯৮ সালে আল বেনিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে হামলা করে। এদের মূল ঘাঁটি কায়রো হলেও বর্তমানে ইয়েমেনে, আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে, লেবানন এবং যুক্তরাজ্যে সক্রিয় রয়েছে। মিশর সরকার অভিযোগ করে আসছে যে, এদের সঙ্গে বিন লাদেনের সখ্যতা রয়েছে। উল্লেখ্য ২০০১ সালে আল-জিহাদ আল-কায়দার সাথে এক যোগে কাজ করার ঘোষণা দেয়।

ইসলামিক জিহাদ

ফিলিস্তিন থেকে মিশরে পড়তে আসা ফাতহী শিকাকী আব্দুল আজীজ উদেহ ও বাশীর মুশা ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী জিহাদ। তাঁরা মিশর থেকে যেমন অন্যান্য সশস্ত্র ইসলামী দলগুলোকে সহায়তা করে তেমনি ইজরাইলী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে থাকে। '৮১ সালে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে হত্যার পিছনে ইসলামীক জিহাদ জড়িত থাকার অভিযোগ উঠলে মিশর থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়। এরপর তাঁরা গাজায় হিজরত করেন।

'৯০ সালে মিশরে এক টুরিস্ট বাসে হামলা করে ৯জন ইসরাইলী সহ হত্যা করে ১১জনকে। '৯৬ সালের মার্চে তেলআবিবে এক ফেদায়ী

(আত্মোৎসর্গকারী) হামলায় ২০জনকে হত্যা করে। আরও একটি গাড়ি বোমায় হত্যা করে ২৫জনকে, আহত হয় ৪০০ জন। পাকিস্তানি রামজি ইউসুফের নেতৃত্বে আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কার পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি বোমা হামলা করে '৯৩সালে এতে ৬জন আমেরিকান মারা যায় এবং আহত হয় ১০০০জনের চেয়েও বেশি। '৯০ দশকে তাঁরা বিন লাদেনের নেটওয়ার্কে জড়িয়ে পড়ে। আল-কায়দাকে তথ্য লকেশন দিয়ে তারা সহযোগিতা করে। বিন লাদেনের উচ্চপদস্থ সহযোগী আইমান আল জাওয়াহিরী, মোহাম্মদ আতেফ ইসলামীক জিহাদের সদস্য।

হরকাতুল আনসার

প্রথমে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য হরকাতুল আনসার সংগঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে বিন লাদেনের সহায়তায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁরা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করে। '৯৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে আল-কায়দার Islamic world front for jihad against the jews and crusaders' কর্মসূচীতে হরকাতুল আনসার স্বাক্ষর করে। সংগঠনের শীর্ষ নেতা ফযলুর রহমান খলিল।

হরকাতুল আনসার কাশ্মীরকে নাপাক মালাউনদের থেকে মুক্ত করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করার জন্য সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা '৯৫ সালের জুলাইয়ে ৫ জন পশ্চিমা ইসলামদ্রহী তাগুতকে হত্যা করে। '৯৪ সালে ২জন বৃটিশ লেঃ কর্নেল ও ভূপিন্দর সিংহকে অপহরণ করে হত্যা করে। তারা বার্মার আরাকানীদের গেরিলা ট্রেনিং ও অস্ত্র সরবরাহ করে। '৯২ সালে বসনিয়াতে এরাই সর্ব প্রথম মুজাহিদ প্রেরণ করে। তাজিকিস্তানেও এরা সক্রিয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এই সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে, জঙ্গি মুহাম্মদ এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন মাসউদ আজহার।

আজবাত আল-আনসার

আজবাত আল-আনসার লেবানন ভিত্তিক ইসলামী মুজাহিদ দল বিন লাদেনের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯০দশকে এ উত্থান ঘটে। '৯০এর মাঝামাঝিতে

লেবাননের নাইট ক্লাবে, থিয়েটারে, মদের দোকানে প্রভৃতির উপর হামলা জোরদার করে। ২০০০ সালে লেবাননে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২টি হামলা করে লাইমলাইটে চলে আসে।

আসবাত আল-আনসার বহুমুখী হামলাকারীর সংগঠন। এরা যেমন মদের দোকান, ডিসকো.বারে হামলা চালায় তেমনি পশ্চিমা শক্তির উপরও। ২০০২ সালের জানুয়ারীতে বৈরুতে অবস্থিত রাশিয়ান দূতাবাসে, আমরিকান ইসলামদ্রোহী তাওত, খৃস্টান ধর্মাস্তকরণ মিশনারীদের টার্গেট করে বেশ কয়েকটা হামলা সংঘটিত করে। উত্তর লেবাননে ফিলিস্তিনী রিফিউজী ক্যাম্পে এদের শক্তিশালী ঘাঁটি রয়েছে। বিন লাদেনের সঙ্গে এদের নেটওয়ার্ক রয়েছে।

আল-কায়দা

বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলামী মুজাহিদ দলগুলোর উত্থান ও বিকাশের জন্য আল-কায়দাকে দায়ী করা হয়। আমেরিকান টুইন টাওয়ারে হামলা করে এরা প্রমাণ করে এরা কতটা দুর্ধর্ষ। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে আল-কায়দা 'Islamic world front for jihad against the jews and crusaders' কর্মসূচী ঘোষণা করে। তারা তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য সারা বিশ্বে বিভিন্ন নামে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করেন।

রাশিয়া আফগানিস্থানে আত্মসন শুরু করলে তাদের মোকাবেলায় বিন লাদেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় "আল-কায়দা" সংগঠনটি। প্রথম দিকে এদের কাজ ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে মুজাহিদ সংগ্রহ করা, অর্থ সাহায্যে করা, ট্রেনিং দেয়া। রাশিয়ার পতনের পর তারা আন্তর্জাতিক ভাবে কাজ শুরু করেন। সবচেয়ে দক্ষ, প্রশিক্ষিত মুজাহিদ দল হিসাবে মনে করা হয় আল-কায়দাকে। এদের রয়েছে ব্যাপক বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা বিস্ফোরণ এবং হামলা চালানোর ক্ষমতা। এরা অর্থনৈতিক ভাবে অন্য কোন দলের চেয়ে বেশি সচ্ছল।

১৯৯৯ সালের ২৮শে নভেম্বর কেনিয়ার এক আবাসিক হোটেলে হামলা চালিয়ে ১৫জনকে হত্যা করে। ১১এপ্রিল তিউনিসিয়ার এক সিনাগগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ১৯জন নিহত হয় এবং আহত হয় ২২জন। ২০০০ সালের ১২ অক্টোবরে এডেন বন্দরে হামলা করে ১৭জন মার্কিন নৌ-সেনাকে হত্যা

করে। '৯৮ সালে কেনিয়ার নাইরোবিতে এবং তানজিনিয়ার দারুস সালামে মার্কিন দূতাবাসে পরপর হামলা চালিয়ে হত্যা করে ৩০১ জনকে। এতে আহত হয় ৫০০০ লোক। '৯৩ সালে সোমালিয়ায় একটি মার্কিন হেলিকপ্টার গুলি করে ভূ-পাতিত করে। '৯২ সালের ডিসেম্বরে ইয়েমেনে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া ১৯৯৪ সালে পোপ জন পলকে, '৯৫ সালে ফিলিপাইনে সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়।

এসব আন্তর্জাতিক মুজাহিদ দলের উত্থান, আল্লাহর রাসূলের (সা) ঐ বাণীই স্মরণ করে দেয় "জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে" সহীহ মুসলিম। তাই একজন সচেতন মুসলিমকে আজ বুঝতে হবে কিসে মুসলমানের অস্তিত্ব রয়েছে? এবং কোন কাজটি করার কারণে সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা এক সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল? আজ সেই বীরের জাতি কেন এত লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নিগৃহীত এর সমাধান এদেশের যারা সচেতন মুসলমান তাদেরকেই খুঁজতে হবে।

ছুটিতে আসা মার্কিন সৈন্যরা ইরাকে ফিরে যাবার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

(২৯ নং পৃষ্ঠার পর)

ছুটিতে স্বদেশ প্রত্যাগত আমেরিকান সৈন্যদের একটি বড় অংশ পুণরায় ইরাকে ফিরে যাবার ভয়ে জার্মানীসহ বিভিন্ন গন্তব্যে পালিয়ে গেছে। কেউ কেউ আত্মগোপন করে আছে।

পেন্টাগন এবং সামরিক মুখপাত্র জো বারলাস সূত্রে প্রকাশ, ইরাকে দখলদার যৌথ বাহিনীর মধ্যে মার্কিন সৈন্যরা সবচেয়ে বেশী আতংক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করছে। এমনকি অনেক সৈন্য তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে নিকটাত্মীয়দের কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য। ঠিক এ পরিস্থিতিতে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ ইরাকে অবস্থানরত সৈন্যদের মানসিক শক্তি উজ্জীবিত করার জন্য দু'সপ্তাহের পর্যায়ক্রমিক ছুটি ঘোষণা করে। কিন্তু এ ঘোষণার পর প্রায় সকল সৈন্য একত্রে ছুটিতে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। ফলে বিপাকে পড়ে কর্তৃপক্ষ। তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি সামলে উঠা সম্ভব হলেও পরবর্তীতে বুমেরাং রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ ঘরে

ফেরা মার্কিন সৈন্যরা নিজেদের জীবন অনিশ্চিত মনে করে আর ইরাকে যাবার পক্ষপাতী নয়।

পেন্টাগন থেকে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, ছুটিতে আসা মার্কিন সৈন্যদের পুনরায় ইরাকে ফিরে যাবার প্রথম ফ্লাইট ছিল ১২ অক্টোবর এবং দ্বিতীয় ফ্লাইট ছিল ২৮ অক্টোবর।

কিন্তু তিন হাজার সৈন্য আর ইরাকে ফিরে যেতে চায় না মর্মে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়। এর মধ্যে এক ডজনের অধিক সৈন্য কোন নোটিশ ছাড়াই পালিয়ে যায়। বারলাস সূত্রে প্রকাশ, শুধু মাত্র কুড়িজন সৈনিক নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছুটির মেয়াদ বাড়িয়েছে এবং পাঁচজন যথাসময়ে ফ্লাইট ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশিষ্ট সৈন্য ইরাকে টহলদার হিসাবে দায়িত্ব পালনে কোনভাবেই রাজী নয়। কারণ তাদের কাছে ইরাক এখন এক মৃত্যু ফাঁদ। প্রতিদিন কোন না কোন স্পটে ইরাকী গেরিলাদের হাতে মার্কিন সৈন্যরা মারা যাচ্ছে এবং গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩২টি গেরিলা আক্রমণের শিকার হচ্ছে মার্কিন সৈন্যরা।

আফগানিস্তানে চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র মুজাহিদরা হামলা বন্ধ করলে আমরা যুদ্ধ বন্ধ করব : মার্কিন মুখপাত্র

কাভকাজ সেন্টার : কাবুল থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ শেষ হবার দু'বছর পর প্রথমবারের মত মার্কিন বাহিনী বলেছে যে, তালিবান ও অন্যান্য মুজাহিদ দল তাদের হামলা বন্ধ করলে তারাও তাদের অভিযান বন্ধ করবে। মার্কিন সামরিক মুখপাত্র কর্নেল রডনি ডেভিস কাবুলে সাংবাদিকদের জানান, আমরা এ ব্যাপারে কোন সময় নির্ধারণ করিনি। তবে মুজাহিদ দলগুলো আগামীকাল তাদের হামলা বন্ধ করলে আমরাও আগামীকাল অভিযান বন্ধ করবো।

তিনি বলেন, মুজাহিদ দলগুলো হামলা চালিয়ে গেলে আমাদের অভিযানও অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় কমান্ড জানায়, তালিবান ও আল-কায়েদাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার সমস্ত সামরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা এখনও ভয়াবহ হুমকি হয়ে রয়েছে।

মার্কিন সেনা বাহিনী জোর দিয়ে জানায় যে, তালিবানরা দুর্বল হয়ে পড়লেও তারা ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম।

মার্কিন কমান্ডরা আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশে ব্যাপকভিত্তিক অভিযান শুরু করার পর এ বিষয়টি আরও প্রকোট হয়ে দেখা দিয়েছে। তালিবান ও হেকমতিয়ার সমর্থিত দলগুলো অবশ্য জাবুল প্রদেশের চারটি অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এসব থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, মুজাহিদদের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র তীব্র চাপের মুখে রয়েছে।

কাবুলে মার্কিন নিয়ন্ত্রণও গোটা দেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারছে না। আফগানিস্তান কয়েকটি উপজাতীয় অঞ্চলে বিভক্ত। এসব উপজাতীয় এলকায় মার্কিন প্রভাব বেশ সীমিত। দেশটিতে মাদক চোরাচালানের সমস্যা সমাধান হয়নি। এছাড়াও অবৈধ মাদক দ্রব্যের উৎপাদনও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তালিবানরা যা পেরেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সেই কাজেই প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালিবানদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে পরিস্থিতি থেকে মুখ রক্ষার চেষ্টা করছে। প্রতি মাসেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তানের প্রধান মোল্লা ওমর বলেছেন, তালিবান এবং তাদের সহযোগীরা এখন মার্কিন বাহিনী এবং কারজাই সরকারের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আক্রমণ চালাতে শুরু করবে। তিনি আফগান নেতৃবৃন্দের প্রতি জোটবদ্ধ হয়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে এবং দেশে একটি বৈধ সরকার গঠনের জন্য লড়াই শুরু করার আহ্বান জানান।

আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি
যাদের ঐমান রয়েছে তারা মান ও জান
দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে
অব্যাহতি কামনা করবে না। আর আল্লাহ
আবদানীদের ডানো জানেন।

(সূরা তাওবাহ-৪৪)

শিবিরের প্রতি

মেসবাহুল ইসলাম

হে সত্য শপথের সঙ্গীন শিবির
ভেঙ্গে দিতে তিমির প্রাচীর;
মুছিতে গ্রানি নিঃসীন রাত্রির
নিয়ে দৃঢ় ব্রত,
তোমার তো হয়েছিল রত
জিহাদী এ কাফেলায়।
তোমাদের তপ্ত লোহর রঞ্জিত করেছিল বাংলার
এ শ্যামল ভূমে,
অবহেলিত মুসলিমাত শান্তির ঘুমে
পরাস্বাত করি;
পড়েছিল ঝাপিয়ে তোমাদের হাতে হাত ধরি।
সেই একদিনের দুর্বীর বীর সেনানী তুমি
আজি শুক হয়ে গেলে সাম্রাজ্যবাদের হুংকার শুনি?
তুমিই তো একদিন শিখায়েছ মোরে,
অসত্যের আশ্ফালন ক্ষণিকের তরে।
আজি কি একথাটি মনে রাখনি তুমি?
হে দুর্বীর শিবিরের দুর্বীর সেনানী।
তুমি কি ভুলে গেলে
মালেক ভাইয়ের লোহধারা
যা করে ছিল দিশেহারা
বিবেকের দ্বারে দিয়েছিল নাড়া!
আজি সত্য করে বল দেখি
অন্তরে রাখি হাত;
তাগুতের সাথে করিতে আত্মত
কি মালেক ভাই দিয়েছিল রক্ত
টি এসসির শক্ত ভাষিনপর!
শোন ভাই সেদিনের দুর্বীর-আত্মিকার নবীন শিবির
তোমার অন্তর এখনো গাহে আগমনী জাগরণীর।
ইসলাম দেখেছে তোমাদের কয়েদখানে,
দেখিছে সেথা আজিও ইসলাম রাজ বলিছে শানে-মানে।
হায় কি জবাব দিবে তুমি
১১৮ ভাইয়ের লোহর আছে!!!
আজি জনবলে বিশ্বাসী তুমি
আদর্শ তব তাগুতের সাথে একাকার,
জিহাদ আজি হয়েছে সংগ্রাম মঙ্গলুমাতের হাহাকার
হয়েছে হাসির খোরাক;
অবাক
করলে গো ভাই আজি ইসলাম শুদ্ধ মানবতারে অবাক
করলে,
কোন আদর্শে শুরু তোমার, আজি, কোথায় চললে?
বুঝিবা
ছুম্মা রদাৎনাহ আসফালা সাফিলীন
ওহ! না-না-না এষে সহে না; এভাবে বিলীন
তুমি হয়োনারে ভাই!
ফিরে এসো কোরআনের ছায়াতলে,
দেখিবে শহিদী মৃত্যুর জয়বা কাকে বলে।
তোমাদের জাগরণে
জান্নাত হতে ক্ষণে ক্ষণে
ফুলকুন্ডি করিবে সঞ্চরি অস্পরা;
আবার এ নশ্বর ধরা
শান্তির সুবাতাসে যাবে ছেয়ে,
আজি কে যেন আগমনী যায় গেয়ে
ফিরে আয় ফিরে আয়!!!
এই শহিদী কাফেলায়
ওপার হতে আজি মুচকি হাসছে আমারি মালেক ভাই।